যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের প্রকাশিত
মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০৩

ঢাকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তক ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেওয়া হলো:

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। এখানে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) নেত্রী খালেদা জিয়া ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরে দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিবেচিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন। জামাতে ইসলামী, বালাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও ইসলামী ঐক্য জোট (আইওজে)কে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি একটি চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। রাজনেতিক দৃশ্যপটে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ -- এ দুটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরালো এবং সহিংসতা রাজনীতির সর্বত্র বিরাজমান। একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সিজি) তত্ত্বাবধানে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচন বিক্ষিপ্ত হানাহানি ও বিচ্ছিন্ন অনিয়মের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সব প্রধান রাজনৈতিক দল বিরোধী দলে থাকাকালে আইন বিষয়ে ও জাতীয় সমস্যায় প্রকৃত বিতর্কে অংশগ্রহণের সামান্যই সুযোগ রয়েছে দাবী করে সংসদ বর্জন করেছে। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর তাৎপর্যপুর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছে এবং প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে। অবশ্য নিম্ন আদালত সরকারী সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে অনিচ্ছুক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। ১৯২৩ সালের দি অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের জনগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা করে এবং স্বচ্ছতা ও সরকারের সকল স্তরের জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃত্বের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব বাহিনীর মুখ্য দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব বহিঃশক্তির হাত থেকে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা। কখনো কখনো তাদেরকে অভ্যন্ত্মরীণ নিরাপত্তারও দায়িত্ব দেয়া হয়। নিরাপত্তা বাহিনীকে এমনকি অত্যন্ত্ম গুরুতর কাজের জন্যও কদাচিৎ শান্তি দেয়া হয়। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে প্রায়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে

থাকে। পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপক দুর্নীতি ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

দেশের অর্থনীতি মুলত কৃষিভিত্তিক ও বাজারমুখী। এর জন্যসংখ্যা আনুমানিক ১৩ কোটি ৮৪ লাখ। সরকার অধিকাংশ সেবা প্রতিষ্ঠান, অনেক পরিবহণ কোম্পানি এবং বৃহৎ নির্মাণ ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানের মালিক। বিগত অর্থবছরে অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.২, যা দারিদ্র তাৎপর্যপুর্ণভাবে হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দরকার তার চেয়ে অনেক কম। দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি যেমন নিচু হারে বেড়েছে তেমনি নিচু হারে বেড়েছে মজুরি ও ভাতা। দেশের অর্থনেতিক অবস্থার মুল কারণ বিভিন্ন ধরনের কাঠামোগত দুর্বলতা, যা সরকার যথাযথভাবে নিরসন করতে পারেনি। হরতাল, যা প্রায়শঃই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, তা অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে। সংস্কারের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের প্রয়াস আমলাতান্ত্রিক একগুয়েমি, কায়েমী অর্থনৈতিক স্বার্থ, ব্যাপক বিস্তৃত দুর্নীতি ও রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ রয়েছে এবং সরকার অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো একাধিক বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী বিডিআর, সহায়ক বাহিনী আনসার ও সেনাবাহিনী অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করেছে। বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় পুলিশ প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত, কখনো কখনো প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করে। গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে পুলিশ নিয়মিতভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং এ কারণে কারাগারে বেশ কয়েকটি মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশের দুর্নীতি একটি সমস্যা। প্রায় কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই শাস্তি হয়না। শাস্তি না হওয়ার এই অবস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকান্ড অবসানে এক গুরুতর অন্তরায় হয়ে রয়েছে। ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ থেকে ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত দেশব্যাপী যে অপরাধ বিরোধী অভিযান চলে, সে সময় সংঘটিত অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন কাজের দায় থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংসদ ফেব্রুয়ারিতে একটি আইন পাশ করে। গুটি কয়েক ঘটনায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাদের বিরুদ্ধে মুলত প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, এমনকি একই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উপদল সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ চলাকালে প্রায়ই একে অপরের সংগে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হত্যাকান্ড সংঘটিত করা সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবর সাধারণ ব্যাপার।

আলোচ্য বছরে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে ধর্ষণ সংঘটিত হওয়ার কোন খবর নেই, তবে পুলিশ বা অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক ধর্ষণের ৩১ ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। তাছাড়া, নারী ও শিশু পাচারে পুলিশ সহায়তা করেছে বা নিজেরাই জড়িত ছিল বলে বিশ্বাসযোগ্য খবর পাওয়া গেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও সংবাদপত্রের খবরে আভাস পাওয়া যায় যে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বহির্ভূত গ্রাম্য শালিশের মাধ্যমে মহিলাদের নৈতিকতা বিরোধী কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। প্রায়ই তা ঘটে থাকে ফতোয়ার মাধ্যমে (যা ঘোষণা করে কোন ইসলামী নেতা)। যেসব শাস্তি দেয়া হয় বেত্রাঘাত তার অন্যতম। প্রেমে প্রত্যাঘাত ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ স্বামী বা প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি কখনো কখনো মহিলাদের মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে।

সরকার স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গ্রেফতার ও আটক করেছে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ফৌজদারী দ□বিধির (সিআরপিসি) ৫৪ ধারা প্রয়োগ করেছে। এই সব ধারার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে নিবর্তনমূলক আটক রাখা যায়। ২০০২ সালে সরকার জামিনের ব্যবস্থা বিহীন জন নিরাপত্তা আইন (পিএসএ)-এর বদলে দ্রুত বিচার আইন (এসটিএ) প্রবর্তন করে। পিএসএ'র স্থলাভিষিক্ত আইনটিতে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি ও জামিনের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিচার বিভাগের নিম্নস্তর নির্বাহী শাখার প্রভাবাধীন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে, যদিও দেওয়ানি মামলায় মধ্যস্থতার ব্যাপক ব্যবহার বিচার ব্যবস্থাকে দ্রুততর করেছে। বিচারপূর্ব দীর্ঘ আটকাবস্থা একটি সমস্যা। পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং সরকার অবৈধ বস্তিবাসিকে জোর করে অন্যত্র সরিযে দেয়। প্রকৃতপক্ষে সকল সাংবাদিকই স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকে। সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ এবং তাদেরকে সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের কর্মী ও অন্যান্যদের ভীতি প্রদর্শনের প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সমাবেশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিরোধীদের সমাবেশের স্বাধীনতা সীমিত করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে চলাচলের স্বাধীনতাও সীমিত করেছে।

সরকার সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার গ্রুপগুলোকে তাদের কর্মকান্ড চালাতে দিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও)কে নিবিড় পরীক্ষা নিরীক্ষার অধীনে এনেছে। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য একটি সমস্যা। সরকার শ্রমিকদের অধিকার, বিশেষ করে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) শ্রমিক অধিকার সীমিত করেছে। ইপিজেডগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং এরা এই সব শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অসমর্থ। শিশু নির্যাতন ও শিশু পতিতাবৃত্তি একটি সমস্যা। নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা। তেমনি সমস্যা হলো পতিতাবৃত্তি ও কোন কোন সময় দাসবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

অনুচ্ছেদ ১ স্বাধীনতাসহ ব্যক্তি সত্ত্বার অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বা বেআইনীভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো বেশ কয়েকটি বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটায়। পুলিশ, বিডিআর, আনসার এবং সেনাবাহিনী অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করেছে। আলোচ্য বছরে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর মারাত্মক শক্তি ব্যবহারে ফলে ৮১ জনের মৃত্যু ঘটে। কারাগারে ও পুলিশ হেফাজতে আরো ১১৩ জনের মৃত্যু ঘটে (অনুচ্ছেদ ১ গ দ্রষ্টব্য)। প্রায় কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই শাস্তি হয়না। শাস্তি না হওয়ার এই অবস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকান্ড অবসানে এক গুরুতর অন্তরায় হয়ে রয়েছে। গুটি কয়েক ঘটনায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাদের বিরুদ্ধে মুলত প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সংসদ অপরাধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচালিত "অপারেশন ক্লিন হার্ট" চলাকালে তাদের সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যাতে কোন আইনী ব্যবস্থা না নেয়া যায় সে জন্য একটি আইন পাশ করে। সেই অভিযান চলাকালে আনুমানিক ৫০ জনের মৃত্যু হয় এবং অজানা সংখ্যক মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়। এই অভিযান চলে ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ থেকে ৯ই জানুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত। জয়েন্ট ড্রাইভ ইনডেমনিটি অ্যাক্ট অভিযান চলাকালে মৃত্যু ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আদালতে ন্যায় বিচার চাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। ১৩ই এপ্রিল হাইকোর্ট এই ইনডেমনিটি আইনের বৈধতা সম্পর্কে সরকারের ওপর নোটিশ জারি করে। বছরের শেষ নাগাদ এই বিষয়ের কোন অগ্রগতি হয়নি।

৪ঠা জুলাই টাঙ্গাইল জেলার গোরাই গ্রামে পুলিশ মোবারক হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে ৪০০ ডলার সমমুলের ২০ হাজার টাকা দাবী করে। তার পরিবার এই অর্থ দিতে না পারায় তার মা জানায় তিনি থানায় পুলিশকে তার ছেলেকে পেটাতে দেখেছেন। পরের দিন মোবারকের ভাইদের জানানো হয় যে সে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার কোন প্রমাণ পায়নি। সরকারী ময়না তদন্তে আত্মহত্যাকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে রেকর্ড করা হয়। ঘটনার পর তিন জন পুলিশকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। মোবারকের স্ত্রী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছিল।

২৩শে অক্টোবর অনুরূপ একটি ঘটনায় পুলিশ ঢাকার খিলগাঁও এলাকার সুমন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ডাকাতি করার কথিত অভিযোগে পুলিশ তাকে তাদের হেফাজতে আনে। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। যে বাড়িতে ডাকাতির কথা বলা হয়েছিল, সে বাড়ির মালিক পরে জানায় যে সুমনকে জড়ানোর জন্য পুলিশ তাকে বাধ্য করে। সুমনের পরিবার থানায় গেলে সেকেন্ড অফিসার তার মুক্তির জন্য ৫০০ ডলার সমমূল্যের ৩০ হাজার টাকা দাবী করে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে সুমনের পরিবার সমুদয় অর্থ যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। পরের দিন সকালে তারা আবার থানায় গেলে সুমনের পিতামাতা তাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তাকে এমনভাবে পেটানো হয়েছিল যে সে দাঁড়াতে পারছিল না। সুমনের বাবা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের সংগে যোগাযোগ করলে সুমনকে জামিনে মুক্তি দেয়ার জন্য আরো এক লাখ টাকা (১৭০০ ডলার) দাবী করে। সুমনের বাবা এই অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে ওসি ক্রুদ্ধ হয়ে পিতামাতার চোখের সামনে সুমনকে পেটাতে শুরু করে। সুমন সংজ্ঞা হারায় এবং তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে সে পরের দিন বিকালে মারা যায়। ওসিকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং সুমনের পরিবার ওসি ও সেকেন্ড অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ৪ঠা নভেম্বর তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি জানায় যে জনতার প্রহারে সুমন মারা গেছে এবং পুলিশ টাকা দাবী করেছিল বলে সুমনের পিতামাতার অভিযোগের সমর্থনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সংবাদপত্রের একটি খবরে বলা হয় যে "অপারেশন ক্লিন হার্ট" চলাকালে ২০০২ সালের অক্টোবরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আবুল হোসনে লিটুকে তার মুরগীর খামারে নির্যাতন করে হত্যা করে। লিটুর স্ত্রী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে একটি নিম্ন আদালত অভিযোগ তদন্তের জন্য পুলিশকে আদেশ দেয়। জয়েন্ট ড্রাইভ ইনডেমনিটি অ্যাক্ট-এ এই মামলা খারিজ হয়ে যায়। লিটুর স্ত্রী এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি আর্জি দাখিল করে।

দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা সর্বত্র বিরাজমান। এই সহিংসতার কারণে প্রায়ই জীবনহানি ঘটে (অনুচ্ছেদ ১ গ এবং অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা এবং প্রায়ই কোন একটি দলের বিভিন্ন উপদলের সমর্থকরা মিছিল ও বিক্ষোভ চলাকালে নিজেদের মধ্যে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সহিংসতায় ৪৩৬ জনের বেশি লোক নিহত হয় এবং ৬২৮১ জন আহত হয় (অনুচ্ছেদ ১ গ, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)। বিগত বছরগুলোর মতো সাধারণ ধর্মঘটের সংগে সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় কোন মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নি।

১৯৯৯ সালে বিএনপি কর্মী সজল চৌধুরী হত্যাকান্ড সম্পর্কে ২০০২ সালে দায়েরকৃত মামলায় প্রধান অভিযুক্ত একজন সাবেক আওয়ামী লীগ এমপির পেশ করা আর্জির ভিত্তিতে হাইকোর্ট মামলা স্থগিত করে দেয়। অভিযুক্ত দাবী করে যে সরকার গুরুত্বের সংগে মামলাটি পরিচালনা করছে না।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ড সম্পর্কিত মামলাটির কোন অগ্রগতি নেই। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সাত জন বিচারকের মধ্যে তিন জন মামলার শুনানী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং হাইকোর্ট স্তরে শুনানীতে অংশগ্রহণ করায় দুজন বিচারপতি এই শুনানী থেকে অব্যাহতি নেয়। এই কারণে আপীল প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরে কারাগারে চার জন উর্ধতন আওয়ামী লীগ নেতার হত্যাকান্ড সংঘটিত করার দায়ে অভিযুক্ত আট জনের মধ্যে চার জনের মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার ৩রা ডিসেম্বর একটি বিশেষ সরকারী কৌঁশুলি নিয়োগ করেন। সংসদে বিরোধী দলের উপনেতার সুপারিশে এই নিয়োগ দেয়া হয়।

উত্তেজিত জনতা কর্তৃক হত্যাকান্ড সংঘটিত করার সংবাদ একটি সাধারণ ব্যাপার। ৩০শে এপ্রিল ময়মনসিংহে ১৩জন কথিত ডাকাতকে হত্যা করা হয় এবং ৬ই ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলায় ৪০ জনের বেশি কথিত ডাকাতকে গ্রামবাসী হত্যা করে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় এবং ভাষ্যকাররা মন্তব্য করে যে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা কাজ করছেনা বলে যে সাধারণ ধারণা রয়েছে, জনতার এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতা তারই প্রতিফলন।

নভেম্বরে নারায়নগঞ্জ জেলার শিল্প এলাকার একটি কারখানায় গারমেন্ট শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায়। পুলিশকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। সংঘর্ষে কামালুদ্দীন নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়। মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনগুলো অভিযোগ করে অনেক গারমেন্ট শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে এবং ধারণা করা হয় যে তারা মারা গেছে। ঘটনার পর একটি হাসপাতালের জরুরী বিভাগে পুলিশ ও বেসরকারী নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক আহত বলে উল্লেখিত ৯৪ জনের একটি তালিকা স্থানীয় একটি এনজিও খুঁজে পায়। দেশী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো ঘটনার তদন্তের জন্য প্রকাশ্যে দাবী জানায়। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ কোন তদন্তের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ভারতের সংগে সীমান্তে গোলযোগ একটি সমস্য হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রের খবর ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে সীমান্তে সহিংসতার কারণে বিগত ছয় বছরে কয়েক শত নাগরিক মারা গেছে। দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায় যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী ৪৪ জনের মতো লোককে হত্যা করেছে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

নিখোঁজ বা গুম করার ঘটনা একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্ত্মবায়ন সমিতি (বিএসইএইচআর)-এর হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে মোট ৯১০ জন অপহৃত হয়। কিছু কিছু অপহরণ ঘটে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৭ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী বখতিয়ারউদ্দীন চৌধুরীকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা তার মুক্তির জন্য ১০ লাখ টাকা (১৭,১২৫ ডলার) দাবী করে। অপহরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে চৌধুরীকে মুক্তি দেয়া হয়। সংবাদপত্রের খবরে বলা হয় চৌধুরী মুক্তিপণ দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের ওপর আবার হামলা হবে এই ভয়ে মুক্তিপণ দেয়ার কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। ২৪শে জুলাই চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামালুদ্দীন চৌধুরীর অপহরণের ঘটনাটির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও পুলিশের সাথে অপহরণকারীদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

২০০০ সালে বিএনপি নেতা নুরুল ইসলামের অপহরণ ও নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মামলাটি ২০০২ সালে শুরু হয় এবং প্রধান অভিযুক্ত আবু তাহেরের খালাশ পাওয়ার মধ্য দিয়ে ডিসেম্বরে তা সম্পন্ন হয়। এই মামলায় অপর পাঁচ জনকে মৃত্যু দ দেয়া হয়। মিন্টু ঘোষের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ২০০২ সালে যে মামলা শুরু হয় তার কোন অগ্রগতি হয়নি।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি

সংবিধানে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক, পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং অন্যান্যভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। হুমকি দেয়া, পেটানো এবং মাঝে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতন করা হতে পারে। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা-এর হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১,২৯৬ জন এবং মারা গেছে ১১৫ জন (অনুচ্ছেদ ১ক, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)। হতাহতের অধিকাংশ নিম্ন বিত্তের মানুষ। সরকার দোষী ব্যক্তিদের কদাচিৎ শাস্ত্মি দিয়ে থাকে এবং এই কারণে পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে।

১৬ই জুন তিন জন পুলিশ কেরানীগঞ্জের পূর্ব পাড়া চুনকুটিয়া গ্রামে বাবুলের বাড়ি গিয়ে তার কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা (৩৫০ ডলার) দাবী করে। তারা তাকে অবৈধ মাদক ব্যবসায় জাড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের সাথে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। সে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করলে পুলিশ তাতে পেটায়। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার কারণে

পুলিশ বাবুলের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও পিতাকে চপেটাঘাত করে ও আঘাত করে। ঘটনার তদন্তের পর তিন জন পুলিশকে সাময়িকভাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয়া হয়।

বিএসইএইচআর-এর মতে আলোচ্য বছরে সরকারী হেফাজতের বাইরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক ধষর্ণের ৩১টি ঘটনা ঘটেছে। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে ১১ই সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার এক জন পুলিশ রুবিনা খাতুন নামে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে । আরেকটি ঘটনায় জানা যায় ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে ছুটিতে থাকা কালে এক জন সৈনিক গাজীপুর জেলার সাফাশ্রীতে ১৪ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় পুলিশ সৈনিকটিকে গ্রেফতার করে এবং বালিকাটির পরিবারকে অর্থ দিয়ে বিনা বিচারে মামলাটির মীমাংসা করা হয় বলে জানা যায়।

তাছাড়া, ধর্ষণের অভিযোগ করার পর মহিলাদের প্রায়ই নিরাপদ হেফাজতে (কার্যত কারাগারে) আটক রাখা হয়, যেখানে তাদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো তাদের সেখানে নির্যাতনের এবং আবার ধর্ষণের শিকার হতে হয় (অনুচ্ছেধ ৫ দ্রষ্টব্য)। আইনে নিরাপদ হেফাজতে মহিলাদের অপরাধীদের সংগে রাখা নিষিদ্ধ হলেও কার্যত কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই। ২০০২ সালে সরকার নিরাপদ হেফাজতে আটক মহিলাদের ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র, এনজিও পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করতে শুরু করে।

পুলিশ কখনো কখনো বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকার মুক্তাঙ্গানের কাছে একটি মিছিলে লাঠি চার্য করে মিছিলে অংশগ্রহণকারী কয়েক জনকে আহত করে।

পুলিশের দুর্নীতি একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে এবং বিশ্বাসযোগ্য খবর রয়েছে যে পুলিশ নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করেছে অথবা নিজেরাই এই পাচার কাজে অংশ নিয়েছে (অনুচ্ছেদ ৬ চ দ্রষ্টব্য)। ২০০২ সালে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আইন কমিশন পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে ৫৪ ধারা সংশোধনের সুপরিশ করে। বছরের শেষ নাগাদ কোন সুপরিশই গ্রহণ করা হয় নি। পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণে হাইকোর্ট ৭ই এপ্রিল ফৌজদারি দ□বিধি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৫-দফা নির্দেশনা জারি করে, যা অক্টোবরের মাঝামাঝি বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। বছরের শেষ নাগাদ তা ঘটেনি (অনুচ্ছেদ ১ঘ দ্রষ্টব্য)। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় একটি সাধারণ ব্যাপার। ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কয়েকবার ধর্মঘট করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও সংবাদপত্রের খবরে আভাস পাওয়া যায় যে বিশেষ করে পল্লী এলাকায়

মাঝে মধ্যে বিচার বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মহিলাদের নৈতিকতা বিরোধী কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। প্রায়ই তা ঘটে থাকে ফতোয়ার মাধ্যমে (অনুচ্ছেদ ১গ দ্রষ্টব্য)। যেসব শাস্তি দেয়া হয় বেত্রাঘাত তার অন্যতম। আলোচ্য বছরে ৩৬টি ফতোয়া দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনায় পাঁচ জনকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং অন্যরা দৈহিক শাস্তি থেকে শুরু করে একঘরে করে দেয়ার মতো বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হয়।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ স্বামী বা প্রতিশোধকামী ব্যক্তিরা কখনো কখনো মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)।

কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং এই কারণে কারাগারে কয়েকটি মৃত্যু ঘটেছে। আলোচ্য বছরে কারা হেফাজতে ৯০ জনের মৃত্যু ঘটে (অনুচ্ছেদ ১ক দ্রষ্টব্য)। সকল কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দী রয়েছে এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে কারাগারগুলোর বন্দীর সংখ্যা আনুমানিক ৬৭,৩৫৪ জন, যা ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিন গুণ। কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা আনুমানিক ২৫,০০০। কারাগারগুলোয় মহিলা বন্দীর সংখ্যা ১,৯১০। ২৭৬ বন্দীর বয়স ১৮ বছরের কম। কারাগারগুলোতে আটকদের মধ্যে ৪৫,১৭৩ জন বিচারের অপেক্ষায় আছে এবং ২১,২৫১ জন সাজাপ্রাপ্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারাকক্ষগুলোতে বন্দীর সংখ্যা এতোই বেশি যে তাদের পালা করে ঘুমাতে হয়। ২০০১ সালে ঢাকার উত্তরে কাশিমপুরে একটি নতুন কারাগারের উদ্বোধন হলেও তার প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ বছরের শেষ নাগাদ এখনো শেষ হয়নি। কারাগারগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ২০০২ সালে সংবাদপত্রের এক খবরে জানা যায় যে একজন উপ মহা কারাপরিদর্শক (ডিআইজি) মৃত্যুর হুমকি পেয়ে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে যান। তিনি কারাগারে অনিয়মের তদন্ত করছিলেন। তিনি চাকু ও মদসহ অননুমোদিত সামগ্রী বোঝাই দুটি ট্রাক আটক করেছিলেন। এই সামগ্রী সেখানে আটক অপরাধীদের জন্য আনা হয়েছিল।

আইনে কিশোর অপরাধীদের বয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে আটক রাখার বিধান থাকলেও সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেককে বয়স্ক বন্দীদের সংগেই কার্যত রাখা হয়। এপ্রিলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত কিশোরদের অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখার এবং এদেরকে দ্রুত কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দেয়। বেসরকারী কারা পরিদর্শকদের তালিকায় শিশু অধিকার সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হাইকোর্ট সরকারের প্রতি আদেশ দেয়। কারাগারে মহিলাদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। কিন্তু একই ধরনের করুণ অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় তাদেরও। সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের থেকে বিচারের অপেক্ষায় আটক ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হয় না। সাধারণভাবে সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিসহ স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের করাগার পরিদর্শনের অনুমতি দেয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার কর্তৃক

নিযুক্ত কমিটি স্থানীয়ভাবে প্রতিটি কারাগার প্রতি মাসে পরিদর্শন করে। কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না। জেলা জজও মাঝে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন। কিন্তু এই সব পরিদর্শনের তথ্যও প্রকাশ করা হয় না।

ঘ. বলপুর্বক গ্রেফতার, আটকাদেশ বা নির্বাসন

সংবিধানে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারকালে তাকে আটকের কারণ জানাতে হবে, তাকে তার পছন্দমতো আইনজীবীর শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং আটকের ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আটক রাখার অনুমতি না দিলে মুক্তি দিতে হবে। অবশ্য সংবিধানে এসব শর্তের বাইরে কয়েকটি সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ নিবর্তনমুলক আটকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বাস্তবে সরকার এমনকি অনিবর্তনমুলক আটকের ক্ষেত্রেও এই সব সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রায়ই লঙ্ঘন করে থাকে।

পুলিশ বাহিনী জাতীয়ভাবে সংগঠিত। সীমান্ত এলাকায় প্রহরা দেয়ার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে অপরাধ বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে প্রায়ই অনিচ্ছুক থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কৃতকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি বা ইনডেমনিটি দিয়ে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার অভাব প্রকট। সরকার অধিকতর সুসজ্জিত একটি পুলিশ ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পুলিশ বাহিনীতে সার্বিক সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু বিরাজমান সমস্যা দুরীকরণে সামান্যই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক করে এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই নাগরিকদের আটকের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন (এসপিএ)-এর মতো জাতীয় নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে হাইকোর্টের দুজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল আটক রাখা সংক্রান্ত আইন ও ক্ষমতা নির্বিচারে অপব্যবহারের জন্য পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করে। এই রায়ের পরও পুলিশের আচরণে কোন পরিবর্তন হয়নি।

ফৌজদারি দন্ডবিধির (১৮৯৮) ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশের (১৯৭৬) ৮৬ ধারার আওতায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অপরাধমুলক তৎপরতার সন্দেহে আটক করা যেতে পারে। প্রথমে ৫৪ ধারা ও ৮৬ ধারায় কিছু লোককে আটক করার পর কোন

অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় এবং অন্যদের কোন অভিযোগ দায়ের ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি স্থানীয় এনজিও অধিকার জানায় যে রাজনৈতিক কারণে মোট ৪৩৬ জন নিহত, আনুমানিক ৬২৮১ আহত হয় এবং ২,৩৮২ জন গ্রেফতার হয় (অনুচ্ছেদ ১ক, গ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)।

জানুয়ারিতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন-এ দুটি বেঞ্চ ২৪৮টি আটকাদেশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে আটক ব্যক্তিদের মুক্তির আদেশ দেয়। আটক ব্যক্তিদের সকলকে ৫৪ ধারা এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ৭ই এপ্রিল হাইকোর্ট (১৬ই এপ্রিল থেকে) ছয় মাসের মধ্যে ফৌজদারি দ□বিধি সংশোধনের জন্য ১৫-দফা নির্দেশনা জারি করে। বলা হয় যে কোন ব্যক্তিকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হলে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখা যাবে না, আটকের সময় আটককারী অফিসারদের আটক ব্যক্তির কাছে নিজেদের পরিচয় দিতে হবে এবং আটক থাকাকালে পরিবার বা আইনজীবীকে আটক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে দিতে হবে। আগস্টে সুপ্রীম কোর্ট ঐ নির্দেশনা সম্পর্কে সরকারের একটি আপীল গ্রহণ করলেও সরকারকে ৭ই এপ্রিলের রায় বাস্তবায়ন করার আদেশ দেয়।

সরকার তার রাজনৈতিক বিরোধীদের ও তাদের পরিবারকে হয়রানী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ৫৪ ও ৮৬ ধারা প্রয়োগ করে থাকে। পুলিশ কখনো কখনো কোন বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আগে কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী কর্মীদের আটক করে এবং ঐ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে। এই সব আটক ব্যক্তিদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক মানদন্ডে নিম্নতম পংতিভুক্ত।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে সরকার বা কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে "দেশের নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে" ৩০ দিন পর্যন্ত আটকের আদেশ দিতে পারেন। এসপিএ'র আওতাধীন অন্যান্য অপরাধের মধ্যে রয়েছে চোরাচালান, কালোবাজারি বা মজুদদারি।। আটকের ১৫ দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে আটক ব্যক্তিকে তার আটকের কারণ জানাতে হবে এবং আটকের ৩০ দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আটকের কারণসমূহ সম্পর্কে একমত হতে হবে অন্যথায় তাকে মুক্তি দিতে হবে। সরকারকে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন বিধিবদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত করতে হয় না। বাস্তবে আটক ব্যক্তিদের কখনো কখনো দীর্ঘতম সময়ের জন্য আটক রাখা হয়েছিল। আটক ব্যক্তিরা আটকের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারেন এবং সরকার তার আশু মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। আলোচ্য বছরে কোর্ট রায় দেয় যে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এসপিএ'র অধীনে আটকাদেশ দেয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। কোর্ট এসপিএর অপব্যবহার করার জন্য অন্যান্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জরিমানাও করে।

একটি উপদেষ্টা বোর্ডের এসপিএ অধীনে আটক ব্যক্তিদের মামলা আটকের চার মাস পর পরীক্ষা করে দেখার কথা। ২০০২ সালে হাইকোর্ট জানায় যে সরকারের আটকের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কোন অধিকার নেই

এবং উপদেষ্টা বোর্ড আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুপারিশ না করলে এসপিএ-এর আওতায় আটক ব্যক্তিদের ৩০ দিন পর মুক্তি দিতে হবে। আটক ব্যক্তি যদি ঢাকায় হাইকোর্টে তার মামলা তুলে ধরতে পারেন, তাহলে হাইকোর্ট সাধারণত তার পক্ষে রায় দিয়ে থাকে। যাহোক, অনেক বিবাদী দারিদ্র্যের কারণে এবং আটকাদেশের কড়াকড়ির কারণে উকিল নিয়োগ এবং তাদের মামলা ম্যাজিস্ট্রেট স্তরের ওপরে নিয়ে যেতে পারেনা। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় ম্যাজিস্ট্রেটরা কোন মামলা খারিজ করতে অনিচ্ছুক থাকে (অনুচ্ছেদ ১৬ দ্রষ্টব্য)। আটক ব্যক্তিদের আইনজীবীর সংগে পরামর্শ করতে দেয়া হয়, তবে তা অভিযোগ দায়ের করার আগে নয়। উপদেষ্টা বোর্ডে কোন আইনজীবী কোন আটক ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। অতীতে সরকার বিশিষ্ট বন্দীকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক রেখেছে এবং এ সময় তাদের সাথে কারো সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি। আলোচ্য বছরে এমন কোন খবর পাওয়া যায় নি।

ঐতিহাসিকভাবে হাইকোর্টের আদেশে এসপিএ-এর আওতাধীন অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে কারণ এসপিএর মামলাগুলো এতোই দুর্বল ও অস্পষ্ট ছিল যে তাদের জামিন দেয়া ছাড়া কোর্টে কোন উপায় ছিল না। ২০০২ সালে পুলিশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বাসভবনের কাছ থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) ১০ জন নেতাকে বিনা ওয়ারেন্টে বা অভিযোগে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। পরে সবাইকে মুক্তি দেয়া হলেও নতুন এসপিএ আটকাদেশের আওতায় বা নতুন করে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলায় (৫৪ ধারা নয়) তাদেরকে কয়েকবার আটক করা হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্ট শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহাকারী এএফএম বাহাউদ্দীন নাসিমের ৫৪ ধারায় আটকাদেশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয়। ২০০২ সালে আগস্টে হাইকোর্ট এসপিএর অধীনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ড: মহিউদ্দীন খান আলমগীরের আটকাদেশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তাকে মুক্তির আদেশ দেয়।

আলোচ্য বছরে সরকার সাবেক এমপি হাজী সেলিম ও কামাল আহমেদ মজুমদার এবং আওয়ামী লীগ নেতা সাঈদ খোকন ও বিসিএল-এর সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিলসহ অনেক বিরোধী কর্মীকে আটকের উদ্দেশ্যে ৫৪ ধারা ও এসপিএ প্রয়োগ করে। ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রণীত জননিরাপত্তা আইন (পিএসএ) ২০০২ সালে সংসদ রদ করে দেয়। পিএসএ রদের এক সপ্তাহ পর সরকার দ্রুত বিচার আইন (এসটিএ) পাশ করে। এই আইনের মেয়াদ দুই বছর, যদি না তার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। আটকের ৩০ দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিশেষ আদালতে বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে এই আইনে। এসটিএ-এর আওতায় জামিনের বিধান রয়েছে, তবে জামিন দেয়ার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক, যে বিধানটি পিএসএ'তে ছিলনা। এই আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরকারীর জন্য ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডের বিধান রাখা

হয়েছে। ২০০২ সালের জুনে এসটিএ'র অধীনে অভিযুক্ত লালমনিরহাট আইনজীবী সমিতির সভাপতি মতিউর রহমানের দায়েরকৃত একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এসটিএকে কেন অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য সরকারের প্রতি আদেশ দেয়। হাইকোর্টে মামলাটি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সাধারণভাবে এসটিএ'র ব্যাপক অপব্যবহারের কোন অভিযোগ নেই।

হাইকোর্টে এক রায়ে ২০০২ সালে ময়মনসিংহে কয়েকটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণের সংগে সংশ্লিষ্টতার কারণে এসপিএ'র অধীনে শাহরিয়ার কবিরের আটকাদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে এবং কবিরকে ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আদেশ দেয়া হয়। কবিরকে একটি বৃটিশ টিভির দুজন সাংবাদিকের সংগে সংশ্লিষ্ট একটি মামলায় ২০০২ সালের ডিসেম্বরে জামিন দেয়া হয়। সিপিজে জানায় যে কবিরকে ৭ই জানুয়ারি মুক্তি দেয়া হয় (অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)।

কয়েকটি মানবাধিকার গ্রুপ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে আটকাদেশের যে মেয়াদটি জামিনযোগ্য নয়, তা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি হাতিয়ার। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সময় পর্যন্ত্ম কারাগারে আটক থাকবেন তা তার কোর্ট প্রদত্ত সাজা থেকে বাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার ৬ই জুলাই ফৌজদারি দ□বিধি সংশোধন করে।

২০০২ সালে জুনে পুলিশ ১১ বছরের একটি বালককে গ্রেফতার করে। আটক এক চোরাচালানী তার সহযোগী হিসেবে সেই বালক ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম বলেছিল। একটি মানবাধিকার সংগঠনের স্থানীয় শাখা ছেলেটির মুক্তির জন্য আদালতে আর্জি পেশ করে। আলোচ্য বছরে এই মামলাটির কোন অগ্রগতি হয়নি। অনুরূপ একটি ঘটনায় ১৪ বছরের একটি বালককে আড়াই বছর আটক থাকার পর ডিসেম্বরে মুক্তি দেয়া হয়। অপরাধীদের পাইকারি গ্রেফতারের সময় ছেলেটিকে আটক করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নি।

অতীতে সরকার রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ধারাবাহিকভাবে আটকাদেশ প্রয়োগ করতো। কিন্তু আলোচ্য বছরে এমন ধারাবাহিক আটকাদেশ প্রয়োগের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

রাজনৈতিক করণে আটকের মোট সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন। অনেক রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করা হয় আবার অনেক অপরাধী নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবী করে। আদালতে মামলা স্তূপীকৃত থাকায় সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অনিচ্ছুক ম্যাজিস্ট্রেটরা সেই সব ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না যেগুলো আসলে রাজনৈতিক মামলা। আটক ব্যক্তিদের ওপর নজর রাখা এবং রাজনৈতিকভাবে হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ, নির্ণয়, বা প্রচার করার ক্ষমতা ও

কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নেই। অধিকাংশ আটকাদেশের মেয়াদ স্থায়ী হয় কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। অধিকাংশ ক্ষেতে বিবাদীরা জামিন পান কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ভুল অভিযোগ খারিজ বা তা থেকে অব্যাহতি পেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে কমপক্ষে ১৫৫ জনকে বিনা বিচারে বা বিনা জামিনে বিভিন্ন মেয়াদে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন আটক রাখা হয়েছে ১১ বছরের বেশি সময় ধরে। এই বিষয়ে একটি আইনী সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে এবং হাইকোর্ট আটক ব্যক্তিদের নাম এবং তাদের আটক রাখার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি আদেশ দেয়। বছরের শেষ নাগাদ বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের দফতরে ঝুলছে। সংবিধানে নির্বাসন দেয়ার বিষয়টির উল্লেখ নেই। সরকার অবশ্য কাউকে জোর করে নির্বাসনে পাঠায়নি।

ঙ. সুষ্ঠু বিচারের অস্বীকৃতি

সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বলবৎ সংবিধানের একটি "অস্থায়ী" বিধান অনুযায়ী নিম্ন আদালতগুলোকে নির্বাহী শাখার অংশ হিসেবে ও তার প্রভাবাধীনে রাখা হয়। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং ফৌজদারি, দেওয়ানি এবং রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলো ক্ষেত্রে প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। যাহোক, আইনী প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে নিম্নতর স্তরে দুর্নীতি রয়েছে।

পুলিশী নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে সাধারণত অনিচ্ছুক থাকে কেননা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ তদন্তের জন্য কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নেই।

আদালত ব্যবস্থার দুটি স্তর। নিম্ন আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট। উভয় আদালতেই ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার শুনানী হয়। নিম্ন আদালত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে গঠিত, যারা সরকারের নির্বাহী শাখার অংশ। সেশন ও জেলা জজগণ বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা পৃথক করার জন্য হাইকোর্ট ১৯৯৭ সালে যে আদেশ দেয় ২০০১ সালে সুপ্রীম কোর্ট তা পুনরুল্লেখ করে। ১৯৯৭ সালের রায়ের কোন কোন অংশ সংবিধান সংশোধন ছাড়াই বাস্তবায়ন করা যায়, রুলিংএ তা উল্লেখ করা হয় এবং সরকারকে বাস্তবায়নের জন্য ৮ সপ্তাহ সময় দেয়া হয়। এই সব নির্দেশনা বাস্তবায়নের সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য সরকারের আবেদন ১৫ বারের মতো অনুমোদন করে এবং ১৮ ই নভেম্বর এই সময়সীমা আরো চার মাসের

মতো বাড়িয়ে দেয়া হয়। আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ মন্তব্য করেন যে এই সব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে ৬ থেকে ৭ বছর লেগে যাবে।

সুপ্রীম কোর্ট দুটি ভাগে বিভক্ত: হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট কোর্ট। হাইকোর্টে মুল মামলাগুলোর শুনানী হয় এবং নিম্নতর আদালতের মামলাগুলোর পর্যালোচনা করা হয়। হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি, আদেশ বা সাজার বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী গ্রহণের এক্তিয়ার অ্যাপিলেট কোর্টের এবং তার রুলিং অন্য সব আদালতের জন্য বাধ্যতামুলক।

বিচার ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মামলা জমে থাকায় ২০০১ সালে আইন মন্ত্রণালয় কিছু কিছু মামলায় "অলটারনেটিভ ডিসপিউট রিজোলিউশন" (এডিআর) বা বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দিয়ে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে। এই সব মামলা দায়েরের আগে কোন আইনজ্ঞের মাধ্যমে নাগরিকরা এই ব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ পায়। সরকারী সুত্রগুলো জানায় যে দেওয়ানি মামলাগুলোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিচার দান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে সরকার একটি খসড়া আইন অনুমোদন করে এবং সংসদ জুলাইতে এডিআর সংক্রান্ত আইনটি পাশ করে এবং একে সিলেট ও চট্টগ্রামে সম্প্রসারিত করে।

আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনজীবীর মাধ্যমে তার প্রতিনিধিত্ব করার, অভিযোগের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার এবং সাক্ষী ডাকার এবং সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে। রাষ্ট্রীয় অর্থে বিবাদীর পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয় কদাচিৎ। আর্থিক সহায়তা দেয়ার কিছু আইনী সহাযতা কার্যক্রম রয়েছে। পিএসএ, এসটিএ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের আওতায় বিশেষ ট্রাইবুনালে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর শুনানী হয় এবং রায় দেয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সব মামলার তদন্ত ও বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে, যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন না হলে মামলা কিভাবে নিষ্পন্ন করা হবে, তা আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি (অনুচ্ছেদ ১ঘ দ্রষ্টব্য)।

আদালতের একটি বড় সমস্যা হলো অনিষ্পন্ন অবস্থায় ঝুলে থাকা বিপুল সংখ্যক মামলা। মামলাগুলোর বিচার কার্যে দীর্ঘ মুলতবী ঘটে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাগারে আটক থাকে। এই অবস্থা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে অনেক ব্যক্তি সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হিসাব অনুযায়ী আদালতে মামলার সংগে জড়িত ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ আদালত কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে।

সরকার জানায় যে তার কাছে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা দাবী করেন যে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের রাজনৈতিক

কর্মকান্ডের জন্য অপরাধমূলক কাজের অভিযোগে সাজা দেয়া হয়েছে। ২০০২ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরি জানান যে ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত ১১,৭০৬ জনকে মুক্তি দিয়েছে। ২০০২ সালের এপ্রিলে পিএসএ প্রত্যাহার আইনটি কার্যকর হয় এবং এসপিএ'র অধীনে কোন মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হবে এবং কোন মামলাগুলো চালিয়ে যাওয়া হবে তা নিরূপনের কর্তৃত্ব সরকারকে দেয়া হয় (অনুচ্ছেদ ১ঘ দ্রষ্টব্য)। এনজিওদের বন্দীদের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ নেই।

সামরিক আদালত ব্যবস্থা থেকে পৃথক কোন সামরিক আদালত বা অন্যান্য সামরিক ট্রাইবুনাল নেই। সামরিক আদালত ব্যবস্থায় কোন বেসামরিক ব্যক্তির হাজির হওয়ার কোন খবর নেই।

চ. গোপনীয়তা পরিবার, ঘর বা চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ব্যাপারে স্বেচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ

আইনে বিধান রয়েছে যে কর্তৃপক্ষেকে কোন বাড়িতে প্রবেশের আগে বিচার বিভাগীয় ওয়ারেন্ট গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট গ্রহণ করে এবং এই বিধান লঙ্ঘনকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না। তাছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাশি চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সরকার বিভিন্ন সময় লোকজনকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র পুনর্বাসিত করে। ২০০২ সালের মার্চে হাইকোর্ট ঢাকার আমতলীতে বস্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আবাসন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশ তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখে এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে কেন আদেশ দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়। ২১শে ডিসেম্বর আবাসন ও ইমারত গবেষণা ইস্টিটিউট কল্যাণপুরে ২০ হাজার লোকের একটি বস্তি বুলডজার দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এবং বস্তিবাসীরা দাবী করে উচ্ছেদ অভিযানের আগে তাদের যথাযথভাবে জানানো হয়নি।

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটিলিজেন্স এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই) সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত লোকদের সম্পর্কে খবর দেয়া এবং তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে চর নিয়োগ করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মী, বিদেশী এনজিও ও সাংবাদিকরা মাঝে মধ্যে এই সব নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক হয়রানির খবর দেয়। তাছাড়া, বিদেশী মিশনারিরা খবর দেয় যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীগুলো এবং অন্যরা তাদের কর্মকান্ডের ওপর ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখে। যাহোক কোন মিশনারি সংস্থাই চলতি বছর হয়রানির খবর দেয়নি।

অনুচ্ছেদ ২ নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু সরকার বাস্তবে এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি।

প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় ব্যতীত একজন নাগরিক প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতে পারে না। রাজনৈতিক সমাবেশ করতে বাধা দিয়ে অথবা তা পন্ড করে দিয়ে সরকার তার বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। অতীতের মতো এবছরও সাংবাদিকরা ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তার আইন বাতিল করার দাবী জানায়। এই আইনে সরকারকে তথ্য পরিবেশন করার আগে একজন নাগরিককে প্রমাণ করতে হবে কেন তার ঐ তথ্যের প্রয়োজন। নাগরিকদের ওপর প্রমাণের ভার অর্পণ করে এই আইন দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তাদের গণ তদারকীর হাত থেকে রক্ষা করছে এবং সকল স্তরে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

শত শত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। কিছু কিছু সংবাদপত্র সরকারের সার্বিক নীতিসমূহ সমর্থন করলেও কয়েকটি সংবাদপত্র সরকারের নীতি ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করেছে। সরকারী মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা ছাড়াও একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সংগে যুক্ত একটি বেসরকারী মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থাও রয়েছে।

সংবাদ নিবন্ধের ব্যাপক প্রকাশনা সত্ত্বেও "রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস" (আরএসএফ) বলেছে, "সশস্ত্র বিদ্রোহী আন্দোলন, আধাসামরিক লোকজন অথবা রাজনৈতিক দলসমুহ সার্বক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জীবনকে বিপদাপন্ন করছে। রাষ্ট্র সাংবাদিকদের রক্ষার জন্য করণীয় সবকিছুই করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যারা এই ধরনের সহিংসতায় নিয়োজিত তারা তাদের সহিংস কার্যক্রম পরিচালনায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রায় কোন রকম বাধাই পাচ্ছে না।

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরাসরি সরকারী বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। কিন্তু সরকার সরকারী বিজ্ঞাপন ও অনুকূল শুল্কে আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট সরবরাহের মতো আর্থিক পন্থা ব্যবহার করে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করেছে। সরকার বলছে যে সরকারী বিজ্ঞাপণ বন্টনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রচার সরকার বিবেচনা করে থাকে। অতীতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক ছিল। তবে, মনে হচ্ছে এখন আর সেই অবস্থা নেই।

একুশে টেলিভিশন (ইটিভি), এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভির মতো কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কেবল টিভি স্টেশন আর রেডিও মেট্রোওয়েভের মতো কয়েকটি স্বাধীন সম্প্রচারকেন্দ্র ছাড়া কার্যত সব কটি বেতার ও টিভি স্টেশন সরকারের মালিকানাধীন এবং সরকার সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

২০০২ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট দু'জন বিএনপিপন্থী শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিকের আবেদনক্রমে বেসরকারী খাতে দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র একুশে টেলিভিশনকে বন্ধ করার আদেশ প্রদান করে। লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় কথিত অনিয়মের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই আদালত থেকে আর কোন আপিল করা সম্ভব নয়। তবে একুশে টিভি বন্ধ ঘোষণা এবং এর যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট এই সব আবেদন ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খারিজ করে দেয়। মে মাসে ইটিভি লাইসেন্সের জন্য আবার আবেদন করে। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে হাইকোর্ট বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশনকে ইটিভির আবেদনের বিষয়ে ৩০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং জব্দকৃত যন্ত্রপাতি ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। সরকার আপিল করলে কোর্ট ৩০ দিনের পরিবর্তে তিনমাসের সময়সীমা বেধে দেয়।

টেলিভিশন ও বেতার, উভয় মাধ্যমেই সংবাদ বুলেটিনগুলোতে অধিকাংশ সময় জুড়ে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকান্ড, এবং তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের খবর। সংবাদে বিরোধীদল সামান্য স্থান পায়। উভয় বেসরকারী স্টেশনকেই তাদের পরিচালনার শর্তানুসারে কয়েকটি সরকারী সংবাদ কার্যক্রম এবং প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের ভাষণগুলো বিনা অর্থে প্রচার করতে হয়। ২০০১ সালে সংসদ রাষ্ট্র পরিচালনাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ বেতার (রেডিও বাংলাদেশ)-কে স্বায়ত্ত্বশাসন দিয়ে দুটি বিল অনুমোদন করে। এই বিল দুটি অনুমোদনের পরও বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের প্রকৃত স্বায়ত্ত্বশাসন নিশ্চিত হয়নি, এবং সরকার আইন দুটো বাস্তবায়ন করেনি। সংবাদ নির্বাচনে সরকারী হস্তক্ষেপ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে।

বেসরকারী পক্ষগুলো কর্তৃক মানহানির ফৌজদারী মামলা করলে সাংবাদিক ও অন্যদের কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ প্রকাশের কারণে ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য কয়েকটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে একাধিক মানহানির ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। এইসব রাজনীতিক এই সব খবরকে মিথ্যা ও মানহানিকর বলে মনে করে। সকল মামলায়ই সাংবাদিকরা আদালত থেকে আগাম জামিন লাভ করেন এবং কোন মামলাই আদালতে ওঠেনি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাগুলো অনিষ্পন্ন অবস্থায় ঝুলছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে রয়েছেন।

একটি মানবাধিকার সংস্থা উল্লেখ করেছে যে আলোচ্য বছরে মোট ৬৫ জন সাংবাদিক আহত হয়। তাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে ৪১ টি। ১০ জন সাংবাদিককে এসময় হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়, ৯০ জন সাংবাদিককে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। ১৯ জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়, ১৪ জনের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ও মানহানির মামলা দায়ের করা হয় এবং ৫ জন সাংবাদিক অপহৃত হয়।

সিপিজে জানুয়ারীর ৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে সাংবাদিক সেলিম সামাদের গ্রেফতারের ঘটনার প্রতিবাদ করে। ব্রিটেনের একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণকারী দলের সাথে কাজ করার পর ২০০২ সালের শেষের দিকে সেলিম সামাদকে ''রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের" অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করা হয়। হাইকোর্ট সামাদকে মুক্তির আদেশ দিলে ১৮ই জানুয়ারী তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সিপিজের মতে, সামাদ বলেন যে আটক অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আনা পুলিশী অভিযোগ অস্বীকার করায় কাঠের লাঠি দিয়ে তার হাঠুতে বার বার আঘাত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা একই চিঠিতে, সিপিজে ঐ একই মামলায় শাহরিয়ার কবিরকে অব্যাহতভাবে আটক রাখার প্রতিবাদ করে। সিপিজে জানায় জানুয়ারীর ৭ তারিখে শাহরিয়ার কবিরকে মুক্তি দেয়া হয়। ২০০২ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণকারী ঐ দলের দুই জন সদস্য ব্রিটিশ টেলিভিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদেশী সাংবাদিক জেবা নাজ মালিক ও লিওপল্ড ব্রুনো সরেনতিনোকে এবং বাংলাদেশের নাগরিক মনিজা প্রিসিলা রাজকে আটক করা হয়। সেলিম সামাদসহ তাদের সবার বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ৫ দিনের পুলিশী রিমান্ডে নেয়া হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে যে দুই জন বিদেশী নাগরিককে এনজিও কর্মী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। সরকার বলে তাদের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ও দেশদ্রোহী কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার জন্য দু:খ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়ার পর দুই বিদেশী সাংবাদিককে ডিসেম্বরের ১১ তারিখে বহিষ্কার করা হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে রাজকে অন্তবর্তী জামিন দেয়া হলেও তাকে অতিরিক্ত চারদিন জেলে থাকতে হয়।

আগস্ট মাসের ৮ তারিখে খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রবর্তন নামের একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিরামন মন্ডলকে গ্রেফতার ও পুলিশের হাতে তার প্রহৃত হওয়ার ঘটনায় সেপ্টেম্বর মাসে সিপিজে প্রধানমন্ত্রীকে আরো একটি চিঠি লেখে। স্থানীয় জেলেদের কাছ থেকে পুলিশ অনেক টাকার মূল্যমানের মাছ চুরি করেছে - এরকম একটি খবর লেখার পর পুলিশ মন্ডলকে হকিস্টিক ও রাইফেল দিয়ে মারধর করে বলে অভিয়োগ পাওয়া যায়। চাঁদাবাজির অভিযোগে দ্রুত বিচার আইনে মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। খুলনা প্রেসক্লাব জানায় পুলিশ পরে মন্ডলকে মুক্তি দেয়।

হিবরু রাইটারস এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ইসরাইলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে নভেম্বরের ২৯ তারিখে সাপ্তাহিক ব্লিটজ পত্রিকার সম্পাদক সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সিপিজের মতে চৌধুরির বিরুদ্ধে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ আনা হয়। আলোচ্য বছরের শেষ পর্যন্ত চৌধুরির বিরুদ্ধে আদালতে আনুষ্ঠানিক কোন অভিযোগ দায়ের না করা হলেও তাকে আটকে রাখা হয়।

২০০২ সালে বাংলা দৈনিক যুগান্তরের সংবাদদাতা মনিরুল হায়দার ইকবালের উপর হামলার ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রে আলোচ্য বছরে কোন অগ্রগতি হয়নি। ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের সমর্থকবৃন্দ অবৈধভাবে চিংড়ি ঘের দখল করে আছে এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারণেই তার উপর আক্রমণ চালানো হয়। ২০০২ সালে অনির্বাণ পত্রিকার রিপোর্টার শুকুর আলির অপহরণের ঘটনারও কোন সুরাহা হয়নি। ২০০২ সালে দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তা নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনার অনুমতি বাতিল করা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। পত্রিকার একটি নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করায় প্রকাশনার অনুমতি বাতিল করা হয়েছিল।

২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে রয়টার্স সংবাদ সংস্থা একটি সংবাদ প্রচার করে। এতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে, ময়মনসিংহ বোমা বিস্ফোরণের সাথে ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা গোষ্ঠী জড়িত থাকতে পারে এবং তিনি এ কারণে জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরাপত্তা অবস্থা জারীর নির্দেশ দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই বিবৃতি অস্বীকার করেন এবং রয়টার্স সংবাদটি প্রত্যাহার করে নেয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে রয়টার্সের খন্ডকালীন সংবাদদাতা এনামুল হক চৌধুরিকে পুলিশ গ্রেফতার করে কারণ তিনিই সংবাদটি দিয়েছিলেন। রয়টার্সের ঢাকা অফিসেও পুলিশ তল্লাশী চালায়। আলোচ্য বছরের শুরুর দিকে এনামুল হক চৌধুরিকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

কিছু কিছু সাংবাদিক সরকারের সমালোচনা করলেও বেশীর ভাগ সাংবাদিকই কিছু মাত্রায় স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকেন। অনেক সাংবাদিকই স্পর্শকাতর সংবাদ এড়ানোর কারণ হিসেবে সম্ভাব্য হয়রানি, প্রতিশোধ ও শারীরিক ক্ষতির ভয়ের কথা উল্লেখ করেন। সরকারী নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক কর্মী ও অন্যদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর সহিংস হামলা এবং তাদের ভীতি প্রদর্শনের প্রয়াস প্রায়ই ঘটে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের পক্ষের লোকেরা সংবাদ পরিবেশনের কারণে সংবাদ অফিস ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। এই সব অপরাধ বহুলাংশে অমীমাংসিত রয়েছে এবং সংবাদপত্রের খবরে এই সব হামলাকারীদের নাম ও দলীয় পরিচয় সনাক্ত করা হলেও তাদের ধরা হয়নি। রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং পুলিশী হামলায় কয়েক জন সাংবাদিক আহত হয়।

নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন জামিনে মুক্তি লাভের পর বিদেশেই অবস্থান করছেন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ এখনও মুলতুবী রয়েছে। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে একটি আদালত নাসরিনের অনুপস্থিতিতেই "ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর" বক্তব্যের জন্য তাকে এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। একজন স্থানীয় জামাত-ই-ইসলামী নেতা ১৯৯৯ সালে নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশী ছায়াছবি পর্যালোচনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশালীনতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, চরিত্র হনন বা নকলের অভিযোগে যে কোন ছায়াছবি সেন্সর বা নিষিদ্ধ করতে পারে। আলোচ্য বছরে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয়ভাবে নির্মিত কোন বাংলা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করেনি। তবে অশালীনতার অভিযোগে সেন্সর বোর্ড বেশ কয়েকটি আমদানিকৃত ইংরেজী চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে। ভিডিও লাইব্রেরীগুলো বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম তাদের সদস্যদের ভাড়া দিয়ে থাকে আর এদের ক্ষেত্রে সরকারী সেন্সর আরোপের চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে তবে তা ফলপ্রসূ হয় না।

সরকার নিউজউইক ম্যাগাজিনের ২৮শে জুলাই সংখ্যা সংখ্যা নিষিদ্ধ করে। কারণ এই সংখ্যায় কোরআনের উৎপত্তি সম্পর্কে একজন জার্মান শিক্ষাবিদের একটি গবেষণার উপর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টারস উইদাওট বর্ডারস- এর মতে কর্তৃপক্ষ বলে যে কোরআন সম্পর্কিত ঐ নিবন্ধটি দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনতে পারে।

বিদেশী প্রকাশনা পর্যালোচনাও সেন্সরশীপের আওতাধীন ছিলো। অশালীন আলোকচিত্র, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অবমাননাকর কোন কিছু লেখা থাকলে অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোন আপত্তিকর মন্তব্য থাকলে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়।

সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে নি।

সরকার শিক্ষাঙ্গনের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে। যদিও সকল স্তরে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ অবাধে তাদের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, তবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ ছিলো।

খ. শান্তিপুর্ণ সভা সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্য, সরকার প্রায়ই এই অধিকার সীমিত করে। ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারার আওতায় সরকার চার জনের অধিক ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরে সরকার ৫৮ বার এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার কখনো কখনো নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু অনেক স্বাধীন পর্যবেক্ষক এই সব ব্যাখ্যাকে অজুহাত বলে মনে করেন। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা প্রায়ই একই স্থানে এবং একই সময়ে তাদের সভার আয়োজন করে থাকে যেখানে বিরোধী দলের সভার সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এর ফলে সরকার সরকার নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারির একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

আলোচ্য বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনেক বার হরতাল আহ্বান করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সহিংসতার হুমকি অথবা হরতালভঙ্গকারীদের প্রতি প্রকৃত সহিংসতার মাধ্যমে এসব হরতাল কার্যকর করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হরতালের সময় মিছিল করে। দেশব্যাপি ৬টি পুর্ণ দিবস ও ৫টি অর্ধ দিবস হরতাল ছাড়াও আলোচ্য বছরে স্থানীয় পর্যায়ে অনেকগুলো হরতাল আহবান করা হয়। হরতালের সময় পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের মিছিলে কদাচিৎ বাধা প্রদান করে এবং তারা বিরোধী দলের মিছিল নিরুৎসাহিত করতে এবং সেগুলো পন্ড করতে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের সাথে একসাথে কাজ করেছে। যদিও জরিপে যদিও দেখা গেছে অধিকাংশ নাগরিক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে হরতাল ব্যবহারের বিরোধী, তবুও সকল বড় বড় রাজনৈতিক দল হরতাল অব্যাহত রাখে।

সংবিধানে নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" প্রতিটি নাগরিকের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার এই অধিকার মান্য করে। ব্যক্তি বিশেষ যে কোন বেসরকারী গ্রুপে যোগ দিতে পারে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। সরকার কার্যত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ তবুও রাজনীতিতে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ

মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনার প্রতি সংবেদনশীল। জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ মুসলমান। কোন অপরাধ করে শাস্তি না পাওয়ার পরিবেশ বিদ্যমান থাকার ফলে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলোকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সরকার তাদেরকে হয়রানি করেছে এরকম কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সরকারী চাকুরী এবং রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কার্যত কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না। ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের কাছে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয় না। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে সকল এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠনকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোন এনজিও-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল, তার নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটক করা অথবা কোন প্রকল্প বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এই ক্ষমতা অবশ্যি কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন এনজিওগুলো সরকারের এই ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

সরকার অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, তাদের যাজকদের প্রশিক্ষণ দান, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, এবং বিদেশে সমধর্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেয়। আইনের আওতায় নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম থেকে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে জোর সামাজিক বিরোধিতা থাকায় অধিকাংশ খ্রীষ্টান মিশনারিদের লক্ষ্য হচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা খ্রীষ্ট ধর্ম পালন করছে তাদের মাঝে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখা। বিদেশী মিশনারিরা দেশে কাজ করতে পারেন, তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত নয়। কিছু মিশনারী ভিসা পেতে অথবা ভিসার নবায়ন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা অবশ্যই বাৎসরিকভাবে নবায়ন করতে হয়। কিছু বিদেশী মিশনারী উল্লেখ করেছে যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য সংস্থা তাদের কাজ খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তবে কোন মিশনারীই আলোচ্য বছরে অন্য কোন ধরনের হয়রানীর কথা উল্লেখ করেনি।

২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে হাইকোর্ট সকল ধরনের ফতোয়া বা ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ মতামত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যদিও হাইকোর্টের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিচার-বহির্ভূত শাস্তি বা দন্ড প্রয়োগের অবসান ঘটানো, কিন্তু হাইকোর্ট প্রদত্ত জানুয়ারির রুলিং-এ সব ধরনের ফতোয়াকেই অবৈধ ঘোষণা করা হয় (অনুচ্ছেদ ১.ক দ্রষ্টব্য)। এর কয়েক সপ্তাহ পর আপীল আদালত হাই কোর্টের রুলিং স্থগিত রাখে। এই বিষয়ে পুনরায় শুনানির কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। ইসলামী আইনে যাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে কেবল সেই সকল মুফতিরাই (ধর্মীয় পন্ডিত) ফতোয়া ঘোষণা করতে পারেন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামের ধর্মীয় নেতারা কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি করে থাকে। সাধারণতঃ, বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া হয়, অথবা কারো নৈতিক সীমারেখা লংঘনের বিষয়ে অবহিত হবার পর শাস্তিস্বরূপ কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়ে থাকে। যাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয় তাদেরকে চাবুক মারা হয়ে থাকে অথবা তাদের সমাজ তাদের পরিত্যাগ বা একঘরে করে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)।

হিন্দু ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের নাগরিকরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। আইন প্রয়োগের বৈষম্যের কারণে, বিশেষ করে 'শত্রু সম্পত্তি আইনে'র জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু লোক সেই ১৯৪৭ সাল থেকে তাদের হারানো সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ২০০১ সালে সংসদে "শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১" পাশ হয়। বর্তমানে বিলুপ্ত 'শত্রু সম্পত্তি আইনে'র অধীনে যে সকল সম্পত্তি দখল/আটক করা হয়েছিল "শত্রু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১" পাশের ফলে সরকারকে সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রকে "শত্রু"র (এক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন) সম্পত্তি দখল করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সরকারকে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা প্রকাশ করতে বলা হয়। তালিকা প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে দাবিনামা পেশ করতে হবে। সরকার বছর শেষে এখন পর্যন্ত অর্পিত সম্পত্তির কোন তালিকা প্রকাশ করেনি।

২০০২ সালের নভেম্বর মাসে সংসদ অর্পিত সম্পত্তি আইনের একটি সংশোধনী পাশ করে যার আওতায় অর্পিত সম্পত্তি প্রতর্পণের ক্ষেত্রে সরকারকে অসীম সময় প্রদান করা হয়। সরকার দাবি করছে এই ব্যবস্থার ফলে সম্পত্তিগুলোকে চুরি হওয়া অথবা বেহাত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে এবং পরে হত্যা এবং আহত হওয়াসহ বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, এবং নির্যাতনসহ হিন্দুদের ওপর নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে নবনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যবর্তী সময়ে বিএনপি সমর্থকরা ভোলা জেলায় কমপক্ষে ১০ জন হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং কয়েকজন হিন্দু নাগরিকের বাড়িঘর লুট করে। এদের মধ্যে একজন মহিলাকে ধর্ষণের দায়ে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে বরিশালের একটি দ্রুত বিচার আদালত দুই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে। দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় বাগেরহাট জেলা থেকেও ধর্ষণ ও লুটতরাজের খবর পাওয়া যায়। নতুন সরকারের সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ট উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত একটি "মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" শীর্ষক কনভেনশনে "সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত নির্যাতনের" অভিযোগ করা হয় এবং এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিচারের দাবি জানানো হয়।

২০০১ সালের শেষের দিকে হাইকোর্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখে হাইকোর্টকে অবহিত করার এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য যে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে তা প্রমাণ করার জন্য আদালত সরকারকে আদেশ প্রদান করে। সরকার বছরের শেষ ভাগে তার রিপোর্ট পেশ করে।

আলোচ্য বছরের ১৯শে নভেম্বর বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কাছে একটি হিন্দু বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলে একই পরিবারের ১১ জন সদস্য জীবন্দ দগ্ধ হয়ে মারা যায়। পুলিশ প্রথমে এই ঘটনাকে ডাকাতি হিসেবে উল্লেখ করলেও অধিকার নামের একটি মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও এটিকে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী একটি পরিবারের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত করে। নভেম্বরের ২২ তারিখে অন্য আরেকটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ঢাকায় আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ ধবংস করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই হামলার পর পুলিশের সম্পদ ধ্বংসে জড়িত থাকার দায়ে পাশ্ববর্তী আরেকটি মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ দুটো মামলা দায়ের করে। পুলিশের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এই আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে বলেন আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা আইন বর্হিভূত। ডিসেম্বরে আহমেদিয়া বিরোধীরা যশোরে একজন প্রখ্যাত আহমেদিয়া নেতাকে হত্যা করে। ২০০৪ সালের ২৩শে জানুয়ারীর মধ্যে আহমেদিয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য তারা সরকারের প্রতি সময়সীমা বেধে দেয়। দাবী মানা না হলে তারা বড় ধরনের বিক্ষোভের হুমকি দেয়।

২০০২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবিরকে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা হত্যা করে। আলোচ্য বছরের শেষ পর্যন্ত এই হত্যাকান্ডের তদন্ত অব্যাহত ছিল। ২০০১ সালে চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা হত্যা করার পর পুলিশের দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন। এই মামলায় চারজন অভিযুক্তকে মৃত্যুদ ও অন্য চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকরা সরকারী চাকুরী ও রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারী চাকুরীর জন্য নিয়োগ কমিটিতে সাধারণত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের রাখা হয় না।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ২০০৩ সালের 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন' দ্রষ্টব্য।

ঘ. দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের, বিদেশ ভ্রমণের, এবং অভিবাসনের ও প্রত্যাবাসনের অধিকার

দেশের অভ্যন্তরে অবাধ চলাচলের অধিকার, বিদেশে ভ্রমণ, অভিবাসন এবং প্রত্যাবাসনের অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। নাগরিকদের দেশের অভ্যন্তরে অবাধ চলাচল, বিদেশ ভ্রমণ, অভিবাসন ও প্রত্যাবাসনের সুয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে সরকার এই সব অধিকার সীমিত করেছে। সিপিজে জানায় ২৯শে নভেম্বর সাপ্তাহিক ব্লিটজ পত্রিকার সম্পাদক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরিকে ঢাকা বিমান বন্দরে গ্রেফতার করা হয়। তিনি হিবব্রু রাইটারস এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একটি সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ইসরাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন (অনুচ্ছেদ ২.ক দ্রষ্টব্য)। মাঝে মধ্যেই প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের চলাচলে বাধা প্রদান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সরকার খুব কমই এগিয়ে এসেছে। চলতি বছরে ইসরায়েলে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট বৈধ ছিল না।

আনুমানিক ৩০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারা দেশের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের আশায় তারা ১৯৭১ সাল থেকে এ দেশে রয়েছে। এরা সবাই অবাঙ্গালী মুসলমান, যারা ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসে। এদের অধিকাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তারা পরে এ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের দাবি জানায়। পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিকভাবে বিহারীদের গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। ৫ই মে জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত বাংলাদেশে জন্মগ্রহনকারী ১০ জন বিহারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। হাইকোর্ট তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক ঘোষণার পর তারা এই অধিকার পায়।

১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত আনুমানিক ২৩৬,০০০ রোহিঙ্গা (বার্মার উত্তরাঞ্চলীয় আরাকান প্রদেশের মুসলমান) স্বেচ্ছায় বার্মায় ফিরে গেছে। আরো অতিরিক্ত ২২,৭০০ শরণার্থী শিবির ত্যাগ করেছে এবং স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করছে। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর সহযোগিতায় সরকার পরিচালিত দু'টি শিবিরে ১৯,০০০ -এর অধিক শরণার্থী বসবাস করছে। ১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে "ইউএনএইচসিআর" সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ করে যে, যে সব শরণার্থী ফিরে যেতে পারছে না তাদেরকে এদেশে কাজ করতে দেয়া হোক, তারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সুবিধা লাভ করুক এবং তাদের

সন্তানদেরকে স্থানীয় স্কুলে যেতে দেয়া হোক। সরকার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং জোর দিয়ে বলে যে, বার্মায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে শিবিরের মধ্যেই থাকতে হবে। বার্মায় ফিরে গেলে নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। শরণার্থীদের উপর অত্যাচারও করা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি স্থানীয় জনগণও বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আলোচ্য বছরে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়, কেননা এ সময় ৩,২৩১ জন শরণার্থী বার্মাতে ফিরে যায়।

১৯৯১ সাল থেকে যে ১০০,০০০ (এক লক্ষ)-এর অধিক রোহিঙ্গা এ দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের কোন রকম আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র ও নিবন্ধীকরণ ছাড়া শিবিরগুলোর বাইরে অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে হয়। নতুন যারা এসেছিল সরকার তাদেরকে প্রথমে আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। সরকার যথাসম্ভব তাদেরকে সীমান্তে ফিরিয়ে দেয়। "ইউএনএইচসিআর"-এর মতে তারা যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, তাদের কিছু সংখ্যক বার্মা সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের ভয়ে পালিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছিল এবং তারা শরণার্থীর মর্যাদা লাভের যোগ্য ছিল। নিবন্ধন করেনি এমন কিছু শরণার্থী, যাদের অনেকেই বার্মাতে সরকারী প্রত্যাবাসনের পর অবৈধভাবে ফেরত

এসেছিল, তারা শিবিরগুলোতে বাস করছে এবং তাদের সেই সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে খাবার ভাগ করে নিচ্ছে যারা শিবিরের নিবন্ধীকৃত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে খাবারের রেশন লাভ করে। বেশ কয়েকবার শিবির কর্মকর্তারা এ ধরনের অনিবন্ধনকৃত ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং পুলিশ 'বিদেশী আইনের' আওতায় তাদেরকে জেলে প্রেরণ করেছে। আলোচ্য বছরে কক্সবাজার এলাকার স্থানীয় কয়েকটি জেলখানায় আনুমানিক ৭০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী আটক ছিল।

শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের আলোকে শরণার্থী বা আশ্রিতের মর্যাদা দেয়ার বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নয়। কার্যত সরকার ভরপূর্বক প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু সব সময় শরণার্থীর মর্যাদা বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে নি। "ইউএনএইচসিআর" সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছিল। সরকার শরণার্থীদের সহায়তার ব্যাপারে জাতিসংঘ শরণার্থী হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর) ও অন্যান্য মানবিক সংগঠনের সাথে সাধারণভাবে সহযোগিতা করে থাকে। "ইউএনএইচসিআর"-এর অনুরোধে সরকার আনুমানিক ১২৫ জন শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীকে অন্য কোন দেশে বসবাসের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বা তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা নয় বার্মার এমন নাগরিক, সোমালিয়া, ইরান এবং শ্রীলঙ্কার নাগরিক। আলোচ্য বছরে সরকার একজন ভারতীয় এবং চারজন বর্মীর আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যারা ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ৩ রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার

দেশের সংবিধান নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ান্তরে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকরা এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে।

বাংলাদেশ একটি বহুদলীয় ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দেশ যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে "উপহার" প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছ থেকে মনোনয়ন "ক্রয়" করে থাকে।

১৯৯৬ সালের একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর আওতায় সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের সর্বসাম্প্রতিক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রধান বিচারপতি এই সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, অথবা তিনি যদি কোন কারণে না পারেন বা অনিচ্ছুক থাকেন তবে অন্য একজন সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বা একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১৯৯৯ সালে হাইকোর্টের এক রুলিংয়ে সংবিধানের এই সংশোধনীর বৈধতা দেয়া হলেও ২১শে জুলাই হাইকোর্টেরই অন্য আরেকটি বেঞ্চ পূর্বতন রায় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ঐ বেঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা দেন। হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চে পরস্পরবিরোধী দুই ধরনের রায় দেয়ায় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়। বছরের শেষ পর্যন্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি।

২০০১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধান অনুযায়ী সে সময় একজন

প্রধান বিচারপতি অধিষ্ঠিত হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে যার দায়িত্ব ছিল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করা এবং ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা। কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ১লা অক্টোবর, ২০০১-এ অনুষ্ঠিত অষ্টম সাধারণ নির্বাচনটিকে দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকবৃন্দ সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ওই নির্বাচনকে "ব্যাপক জালিয়াতি" বলে অভিযোগ করেন। তবে, শেষ পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং সংসদে বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।

জানুয়ারীর ২৫ তারিখ থেকে মার্চের ২৬ তারিখ পর্যন্ত ৪,০০০- এরও অধিক ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। যদিও কিছু কিছু এলাকায় সহিংসতা ও নির্বাচন কেন্দ্রিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সাধারণভাবে এই নির্বাচন ছিল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। পুলিশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৫টি মৃত্যু ও ১০৫টি সহিংসতার ঘটনা নিশ্চিত করে। তবে সাংবাদিকদের মতে এই সংখ্যা হবে ৫০ থেকে ৮০'র মধ্যে। তালিকাভুক্ত ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগের বেশী ভোট প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করার জন্য ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই সব পরিবর্তনের আওতায় আরো রয়েছে যে একজন সংসদ সদস্য যদি তার দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে তার দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে তিনি সরাসরি তার সংসদীয় আসন হারাবেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিধান সংসদের ওপর সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণকে আরো সুসংহত করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে সংসদের সামান্য অথবা কোনরকম সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী নিজেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংশোধনী' (রিপ্রেজেন্টেশন অব দি পিপল অ্যামেন্ডমেন্ট) নামে একটি অধ্যাদেশ পাশ করে। এতে বহু-প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়সমূহ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আরো কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। তাছাড়া নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী চাঁদা এবং নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের রেকর্ড রাখতে হবে এবং সঠিক হিসাব থাকতে হবে। এই অধ্যাদেশে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পর্যবেক্ষকদের জন্য অনুমতি সঙ্কলিত করা হয়েছে।

আগস্ট মাসের ২১ তারিখে একটি সংসদীয় আসনে শান্তিপূর্ণ ও মোটামুটি সুশৃঙ্খলভাবে সংসদীয় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটার উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৬৩ ভাগ। বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী এই আসনে বিজয়ী হয়, আওয়ামী লীগ ফলাফল বর্জন করে।

৩০০ আসনের সংসদে মহিলা ছিল ৭ জন। মহিলারা সংসদের যে কোন আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসন বজায় রেখে মহিলাদের জন্য কমপক্ষে আরো ৬০টি আসন যোগ করতে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দলই নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছিল। তবে এই নির্বাচনী বিধান চালু করার জন্য বিএনপি বা আওয়ামী লীগ কেউই আলোচ্য বছরে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাদী জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, প্রকৃতি উপাসক ইত্যাতি) কোন নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত নেই। দেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ১৭ শতাংশ সংখ্যালঘু এবং তারা সংসদীয় আসনের শতকরা তিন ভাগেরও কম আসন লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৪ মানবাধিকার লংঘনের কথিত অভিযোগ তদন্তের কাজে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

বিভিন্ন ধরনের দেশী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাধারনভাবে সরকারের বাধা ছাড়া স্বাধীনভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও'র মধ্যে রয়েছে অধিকার, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি এ্যানফোরসমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, শিশু অধিকার ফোরাম, আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিকটিমস, নারী পক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষধ ও জাস্টিস এ্যান্ড পিস কমিশন। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমূহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ মেনে চলে।

মানবাধিকার সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা মোকাবিলায় সরকারী কর্মকর্তারা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নেয়। তবে চলতি বছরে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও আই.সি.আর.সি'র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাথে সংলাপের সূচনা করে। অবশ্য এই দুটো সংগঠনের কোনটিরই প্রতিনিধি এ বছর বাংলাদেশ সফরে আসেনি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং বহু বার জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার একটি স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করে নি। পুববর্তী সরকারও বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও একটি মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।

২০০২ সালের শুরুতে সরকার ন্যায়পাল ('ওমবুড্সম্যান ') নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর করে নি।

সরকার কয়েকজন মানবাধিকার প্রবক্তা ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনা অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য 'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করেন, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী জানিয়েছেন যে তারা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

২০০২ সালের শেষের দিকে সরকার দেশের অভ্যন্তরে এনজিও কার্যক্রমের ওপর একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে। এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে এনজিওগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা। এই রিপোর্টের আসন্ন প্রকাশের ব্যাপারে বেশ কয়েকবার বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও বছরের শেষ পর্যন্ত এই খসড়া নীতিমালা প্রকাশ করা হয় নি।

অনুচ্ছেদ ৫ জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শারীরিক অক্ষমতা, ভাষা অথবা সামাজিক মর্যাদার কারণে বৈষম্য

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, "আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং সকল নাগরিক আইনের সমান সুরক্ষা পাবার অধিকারী।" বাস্তবিকপক্ষে, বৈষম্য নির্মূলের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সরকার দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে নি। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে যারা এইচ.আই.ভি প্রতিরোধে কাজ করেন তারা সরকারী ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। যেসব গোষ্ঠীর মধ্যে এইচ.আই.ভি/এইডস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে তাদেরকেও বড় ধরনের বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

নারী

গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। তবে, অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান এবং এধরনের সহিংসতা প্রকাশ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে বিরাজিত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকার ফলে কারণে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ছিল। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বেশিরভাগই যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধিতার সাথে সম্পর্কিত। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৩ সালে ২৬১ জন মহিলা যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য বছরে আরো ২৩ জন মহিলা আত্মহত্যা করেছে, এবং যৌতুকের কারণে সৃষ্ট বিরোধের ফলে ৮৫ জন মহিলার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

আইন অনুযায়ী ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। আলোচ্য বছরে ১,৩৩৬টি ধর্ষণের ঘটনা জানা গেছে। ধর্ষণকারীদের বিচারে তেমন সামঞ্জস্য থাকে না। বহু ধর্ষণের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার মেয়েরা সামাজিক কলঙ্কসহ ধর্ষণ পরবর্তী মানসিক নির্যাতনের যন্ত্রণা এড়াতে আত্মহত্যা করে।

আইনের আওতায় মহিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ। এই সব আইনের মধ্যে রয়েছে, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বিরোধী আইন, এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত নির্যাতন এবং সহিংসতার অভিযোগ বিচারের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলী রয়েছে। আইনে কঠোর সাজা, নির্যাতিতদের ক্ষতিপুরণ দান, এবং কাজে অমনোযোগিতা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ না করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। ২০শে জুলাই এই আইনের একটি সংশোধনী কার্যকর হয় যার আওতায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িতদের শাস্তির বিধানগুলো এবং নারীদের "অসম্মানজনক" ঘটনার কারণে আত্মহত্যার কারণ উদঘাটনের বিধানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারী সূত্রগুলোর মতে, দুস্থদের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছয়টি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে যেগুলোর মোট লোক ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার তিনশ'। এছাড়াও, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ছয়টি বিভাগীয় সদর দপ্তরের প্রতিটিতে একটি করে মোট ছয়টি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে।

২০০২ সালের মে মাসে সমাজ কল্যাণ দফতর ঢাকায় একটি নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্র চালু করে। ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) পরিচালিত দু'টি হেফাজত কেন্দ্র রয়েছে। কিছু সংখ্যক এনজিও দুস্থদের জন্য এবং দুস্থ নারী ও শিশুদের আশ্রয় প্রদান করে থাকে। তবে যারা নির্যাতনের শিকার তাদের জন্য এই সব কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যার ফলে সরকার ধর্ষণের অভিযোগকারী মহিলাদের "নিরাপত্তা হেফজতে" রাখে যার অধিকাংশই কারাগারগুলোতে অবস্থিত। নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা নির্যাতিতরা অধিকাংশ সময়েই আরও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে যার ফলে অন্যান্য মহিলারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত সহিংসতা সম্পর্কে অভিযোগ করা থেকে নিরুৎসাহিত বোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের দীর্ঘকাল যাবৎ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে দেয়া হয় এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)।

পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বিভাগ বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা ও ফতোয়ার মাধ্যমে মহিলাদের শাস্তি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সব ঘটনার মধ্যে রয়েছে নৈতিক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মহিলাদের শাস্তি প্রদান, যেমন বেত্রাঘাত করা (অনুচ্ছেদ ২.গ দ্রষ্টব্য)।

এসিড হামলা ক্রমশঃই একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে। হামলাকারীরা বহু সংখ্যক মহিলার মুখে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে এবং এর শিকার পুরুষের সংখ্যাও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের শিকারদের মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে তারা দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। এ বছর প্রায় ৩৩৭টি এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার অর্ধেকেরই শিকার হচ্ছে মহিলা এবং এক-তৃতীয়াংশ

শিশু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমিকার প্রেম লাভে ব্যর্থ প্রেমিকরাই মেয়েদের মুখে এসিড ছুড়ে মেরেছে। এসিড হামলাকারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই শাস্তি লাভ করেছে। ২০০২ সালের মার্চ মাসে সরকার এসিডের সহজ লভ্যতা নিয়ন্ত্রণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে এসিড সহিংসতার ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে আইন জারি করেছে। তবে এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় এর কার্যকারিতা সীমিতই রয়ে গেছে। নতুন এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় অপরাধীকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে দ্রুততর বিচারের বিধান রয়েছে। এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের সাধারণত জামিন দেয়া হয় না।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হারে নারী পাচার অব্যাহত ছিল। এছাড়া আরো বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে এই সব পাচারকার্যে পুলিশ সহায়তা করেছে অথবা তারা সরাসরি সংশিষ্ট ছিল (অনুচ্ছেদ ৬.চ দ্রষ্টব্য)। সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে ১৮ বছরের বেশী বয়স্কদের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ বৈধ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের স্থান গৌণ। সরকার তাদের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আনুমানিক ২৯ শতাংশ, তুলনায় পুরুষদের মধ্যে তা শতকরা ৫২ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়াদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মেয়ে। নিরক্ষরতার উচ্চ হার, এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে মহিলারা বেশির ভাগ সময়েই তাদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এ ছাড়া সামাজিকভাবে কলংকিত হবার ভীতি এবং আদালতের আশ্রয় নিয়ে আইনগত সহায়তা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে মহিলারা প্রায়শঃই আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। মহিলাদেরকে তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই অধিকার প্রয়োগে তাদের উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করার লক্ষ্যে বহুসংখ্যক বেসরকারী সংগঠন কাজ করে চলেছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারও তার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষা কর্মসূচী সম্প্রসারণ করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের (আনুমানিক ১৮ বছর বয়স) জন্য শিক্ষা ফ্রি করেছে সরকার। সেই তুলনায় ছেলেদের জন্য শিক্ষা ফ্রি করা হয়েছে পঞ্চম শেণী পর্যন্ত।

মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্সের আওতায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পল্লী এলাকায় অনেক বিয়েরই কোন রেজিস্ট্রি হয় না আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

বিগত দশকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের চাকুরীর অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের বিকাশ। পোশাক শিল্পে কর্মরত ১৪ লাখ কর্মীর আনুমানিক ৮০ শতাংশই ছিল মহিলা। মহিলারা কৃষি, মৎস শিল্প, এবং পশুপালন খাতে কর্মে নিয়োজিত। এছাড়াও তারা নির্মাণ শিল্পে শ্রমিক এবং সাধারণ উৎপাদন খাতে কাজ করেছে। পল্লী অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী সম্প্রসারণ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। একই ধরনের কাজে মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ বেতন পেয়ে থাকে।

স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচ্য বছর গৃহকর্মে নিয়োজিত ৬০ জন গৃহপরিচারিকা তাদের চাকুরীদাতাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে। আরো ২৭ জনের ওপর নির্যাতন চালানো হয় তবে তারা মারা যায়নি।

২০০০ সালের গণপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলারা সরকারী পদের মাত্র শতকরা ১২ ভাগে অধিষ্ঠিত রয়েছে যার শতকরা দুই ভাগ মাত্র উচ্চ পদ। সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক মহিলা নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী নীতির কার্যকারিতা ছিল সীমিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগকৃত মোট জনগোষ্ঠির প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ হচ্ছে মহিলা।

শিশু

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সরকারী উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পুরক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এই দেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে, অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে আলোচ্য বছর ৫৭৫টি শিশু অপহরণ করা হয়, ১৩০০-এর অধিক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং ৩,১০০-এর অধিক শিশু ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, এবং এসিড আক্রমণের মত মারাত্মক ঘটনার শিকারে পরিণত হয়।

ক্যামপেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর ২০০২ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে আশি শতাংশের অধিক বিদ্যালয়ে নাম লিপিবদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে বালক ও বালিকাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। প্রায় ৭০ শতাংশ শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে। পল্লী এলাকার ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী বালিকাদের স্কুলে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখার জন্য সরকার কার্যকর উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ দেশের সবচাইতে বড় এনজিও ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি) ১২ লক্ষেরও অধিক শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর এবং কিছু সহযোগী এনজিও'র সহায়তায় ইউনিসেফ দেশের বিভিন্ন শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে বসবাসরত সাড়ে তিন লক্ষ (৩৫০,০০০) শিশুকে শিক্ষা প্রদানের একটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। এই শিশুরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পঞ্চাশ হাজারেরও (৫০,০০০) বেশি শিশুর জন্য শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ১৯৯১ সালে সরকার ছয় থেকে দশ বছরের শিশুদের জন্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। তবে এই আইন এখনো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও কিছু বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ছেলেশিশু ও মেয়েশিশুদের স্কুলে ভর্তি হবার হার মোটামুটিভাবে সমান ছিল। মোট শিশুদের মধ্যে আনুমানিক ৭০ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে। অধিকাংশ স্কুলেই দুই শিফটে ক্লাশ হয়ে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অধিকাংশ শিশুই দিনে মাত্র আড়াই ঘন্টা শ্রেণী কক্ষে অবস্থান করে; আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিশুরা শ্রেণী কক্ষে অবস্থান করে চার ঘন্টা। পল্লী অঞ্চলের ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। স্কুলগামী মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত এই সব ব্যবস্থাদি ফলপ্রসূ হয়েছে।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই অত্যন্ত কম বয়সে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রায়ই শিশুদের ওপর নির্যাতন হয়। বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের সাথে তাদের চাকুরীদাতারা দুর্ব্যবহার করে। বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে অনেক সময় সেই শিশু কাজের মেয়েদেরকে প্রায় ক্রীতদাসের মতো এবং পতিতার মতও ব্যবহার করা হয়। (অনুচ্ছেদ ৬.গ এবং ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। শ্রম সম্পর্কিত এই শিশু নির্যাতন সাধারণভাবে সমাজের সকল স্তরে এবং সারাদেশেই ঘটে থাকে। আলোচ্য বছরে মাঝে মাঝে কর্মস্থলে শিশুদের মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে (অনুচ্ছেদ ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিশুদের ত্যাগ করা, অপহরণ এবং শিশু পাচার একটি ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। শিশুদেরকে ব্যাপকভাবে পাচার হচ্ছে মূলত ভারতে, পাকিস্তানে এবং দেশের অভ্যন্তরেও। এই সব পাচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে এবং শ্রমদাস হিসেবে নিয়োজিত করা (অনুচ্ছেদ ৬.চ দ্রষ্টব্য)।

সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস এর ২০০২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ। এদের মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মা-বাবা সম্পর্কে কিছু জানে না।

ইউনিসেফ-এর হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ শিশু পতিতা রয়েছে। অন্যান্য হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা ২৯,০০০। সরকারী সার্টিফিকেটসহ ১৮ বছরের অধিক বয়সী মেয়েদের জন্যে পতিতাবৃত্তি বৈধ। তবে কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন বয়সের এই বিধানকে বয়স সম্পর্কিত মিথ্যা সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সাধারণত উপেক্ষা করে থাকে। যারা নাবালিকাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়ে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং পতিতালয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক শিশু পতিতা কাজ করেছে।

যে সকল শিশুর মা-বাবা কারারুদ্ধ তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি অত্যন্ত কম।

প্রতিবন্ধী নাগরিকবৃন্দ

বাংলাদেশের আইনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমান আচরণ ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। 'বাংলাদেশ শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন'-এর আওতায় প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক লোকেদের মতোই সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অক্ষমতা প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও চাকুরি, যানবাহনে সমান প্রবেশাধিকার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার ওপর মনোনিবেশ করা হয়েছে। এই প্রথম বারের মত আলোচ্য বছরে সরকার কয়েক জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে সরকারী পদে চাকুরী দিয়েছে। প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্মরত ৮০টিরও অধিক এনজিও-এর একটি সমন্বয়কারী সংগঠন "ন্যাশনাল ফোরাম অব অরগানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দ্য ডিজএবলড্"-এর বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ১৪ শতাংশ মানুষের কোন না কোন ধরনের শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যে বিশেষ ধরনের পরিচর্যা ও মনোযোগ প্রয়োজন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ পরিবারই আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তা প্রদান করতে পারে না। এছাড়াও, কুসংস্কার এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি বা আশংকার কারণে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেগুলোও অপর্যাপ্ত। তবে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমুলক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আদিবাসী নাগরিকবৃন্দ

উপজাতীয় জনগণের নিজেদের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার খুব সামান্যই ক্ষমতা আছে। ১৯৯৭ সালে সাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি সেখানকার ২৫ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে, যদিও সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ অব্যাহতই ছিল। ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতি ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করা। ২০০১ সাল পর্যন্ত এই কমিশনের কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না এবং এর ফলে কমিশন ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে তেমন কার্যকর ও ফলপ্রসুভাবে কাজ করতে পারেনি। বিদ্রোহের সময় যে সব উপজাতীয় নাগরিক সংস্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ভূতপূর্ব বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমা প্রধানমন্ত্রীর সাথে ২০০২ সালের বিভিন্ন বৈঠকের আলোকে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন, তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা আদালত স্থাপন, এবং আইন শৃংখলা উন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিক করার লক্ষ্যে আলোচনার উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই

পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতার ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্টের তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিককার সহিংসতার ঘটনায় ২৭০টিরও বসত বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় এবং তিনটি বৌদ্ধ মন্দির ভাংচুর করা হয়, এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং ১০ জন আহত হয়। সেনাবাহিনী খুব তাড়াতাড়ি আইনশৃংখলা ফিরিয়ে আনে এবং প্রধানমন্ত্রী গৃহহীনদের সাহায্য করতে সম্মত হন। আলোচ্য বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণর আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ ব্যাপকভাবে বিস্ত্মার লাভ করে।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার একটি রাস্তা থেকে বন্দুকের মুখে তিনজন বিদেশী প্রকৌশলীকে অপহরণ করা হয়। ওই বছরের মার্চে তাদের মুক্তি দেয়ার পর জিম্মিদের একজন একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদককে জানান, অপহরণকারীদের একজন তাকে গোপনে বলেছিল যে তাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক ছিল না, বরং তারা চাকমা জনগণের কল্যাণের জন্য অর্থ আদায় করতে চেয়েছিল। ওই ঘটনার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দাতাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম থেমে যায়।

২০০২ সালে জাতিসংঘ জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)-র অধীনে সরকারী ও দাতা সংস্থাসমুহের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সেখানে আবার নতুন করে উন্নয়ন সহযোগিতার সম্ভাবনা বিষয়ে ১১-দিনব্যাপী একটি মুল্যায়ণ জরিপ চালায়। পরবর্তীতে তাদের প্রদত্ত রিপোর্টে দলটি জানায়, আঞ্চলিক দলীয় কোন্দল এবং চাঁদাবাজ চক্রগুলোর উপস্থিতির কারণে উন্নয়ন কর্মীদের অপহরণ এবং চাঁদাবাজি এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে রিপোর্টে আরো বলা হয় যে এই পার্বত্য এলাকার বেশির ভাগ অঞ্চলের নিরাপত্তা ভাল এবং তা পুনরায় উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার জন্য যথেষ্ট ভালো। তবে উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয়দের মধ্যে মতপার্থক্য, ভূমি, নির্বাচন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে তাতে করে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং সংঘাতের সম্ভাবনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় মানুষও বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর বিষয়টি উলেখ করেছেন। ২০০১ সালের বন বিভাগ মৌলভি বাজারে প্রধানতঃ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খাসিয়া পল্লীতে একটি ইকো-পার্কের উদ্বোধন করে। যদিও আদিবাসী খাসিয়ারা এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছিল, কিন্তু সরকার এই জমির ওপর তাদের মালিকানা স্বীকার করছিল না। সরকার এই জমির মালিকানা দাবি করে বলেছিল যে খাসিয়ারা অবৈধভাবে এই জায়গা দখল করে আসছিল। ইকো-পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার আলোচ্য বছরে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি, তবে এই প্রকল্প এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিলও হয়ে যায়নি।

অনুচ্ছেদ ৬ শ্রমিকদের অধিকার

ক. সমিতি করার অধিকার

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সমিতিতে যোগদান করার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সমিতি গঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে সরকার এটার প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল ছিল না। দেশে মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে ১৮ লাখ নানা ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এই সব ইউনিয়নের বেশীরভাগ আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। ইনফরমাল সেক্টর বা অপ্রচলিত খাতে কর্মরত শ্রমজীবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। এই খাতে কর্মরত রয়েছেন দেশের মোট শ্রমশক্তির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ।

কোন কারখানায় ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণ করতে হলে তাতে সেখানকার শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশের অংশগ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে। তাছাড়া, নিবন্ধীকরণের আগে সম্ভাব্য ইউনিয়নকর্মীদের অনেক কর্মকান্ডে

অংশগ্রহণ করা থেকেও নানা অজুহাতে বিরত রাখা হয়। এই সময়ে মালিকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা নিলেও তার বিরুদ্ধেও কোন আইনী সুরক্ষা নেই। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, এই বিধান শ্রমিকদের সংগঠন করার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বেসরকারী খাতে সংগঠন করার স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করছে। একই কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধীকরণের জন্য ৩০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামুলক করার বিধানটি সংশোধনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিভিন্ন কর্মস্থলে বিভিন্ন মালিকের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করা হলে তার নিবন্ধীকরণ না করার যে আইনগত বিধান আছে তা সংশোধন করার জন্যও আইএলও সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। আনুমানিক ৫,৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারীভাবে নিবন্ধিত ২৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাথে সংশিস্ট বা অঙ্গীভূত। অনিবন্ধিত আরো কয়েকটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এনটিইউ) কেন্দ্র রয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর চরিত্র ছিল কঠোর ভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলোতেই এগুলো ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী যেমন সরকার পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে। ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের এগুলোতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দকেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস শ্রম আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে যেকোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। তবে আলোচ্য বছর এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে নিবন্ধিত ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দেওয়ানি দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এই সব বিধানের প্রয়োগ অবশ্য অসম। অতীতে পরিবহন অবরোধের মতো অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য পুলিশ ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা নিয়মিত ফৌজদারী বিধিতে গ্রেফতার করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে তালিকাভুক্ত হতে কোন বিধিনিষেধ নেই। ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলো এ ধরনের বিভিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরকে আইএলও'র সভায় যোগ দিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এই ধরনের অনুমতি প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতির কোন খবর আলোচ্য বছর পাওয়া যায়নি।

সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও'-র বিশেষজ্ঞ কমিটি ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভে এবং ইউনিয়ন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কতিপয় বাধা নিষেধ, সরকারী কর্মকর্তা সমিতির কর্মকান্ডেও ওপর বাধা-নিষেধ, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় যৌথভাবে সংগঠিত হবার এবং দর কষাকষি করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ এবং হরতাল করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধসহ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে কতিপয় ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক ইউনিয়ন করার অপরাধে ২০০২ সালে বাংলাদেশ ডিপোমা নার্সেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য ১০ জন সদস্যদের ওপর হয়রানি করার ও ব্যবস্থা নেয়ার যে অভিযোগ ছিল তা সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও' কমিটি পর্যালোচনা করে দেখে। 'আইএলও' সরকারকে সংগঠনের সভাপতি তাপসী ভট্টাচার্যকে তার চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য অনুরোধ করে এবং অন্যান্য ১০ জন সদস্যকে দেয়া হুঁশিয়ারীমুলক চিঠিও তাদের ফাইল থেকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ করে। ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস (আইসিএফটিইউ)-এর তথ্য অনুযায়ী হাই কোর্ট তাপসী ভট্টাচার্যের চাকুরী থেকে অপসারণের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে এবং সরকার তাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করে।

খ. সংগঠিত হবার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে মালিকদের দ্বারা ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠকদের প্রতি বৈষম্য করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কার্যতঃ বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা সাধারণত কখনো কখনো স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যে কোন ধরনের ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন কর্মকান্ডের সংগে জড়িত বলে সন্দেহে শ্রমিকদের জোর করে বদলী করার বা কর্মচ্যুতির বিধান রয়েছে। তবে কর্মচ্যুতির জন্য ২ সপ্তাহের বেতন প্রদান বাধ্যতামূলক। কার্যতঃ বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা সাধারণত কখনো কখনো স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যে কোন ধরনের ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার বৈষম্যের অভিযোগ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন এবং অনেক মামলায় শ্রম আদালত ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন। যাহোক, মামলা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার কারণে শ্রম আদালতের কার্যকারিতা সার্বিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই সব পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প কৌশল কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষি বৈধ তবে শর্ত থাকে যে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথ দর কষাকষির এজেন্ট হিসেবে বৈধভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নই কেবল তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। ওষুধ শিল্প, পাট শিল্প বা বস্ত্র শিল্পের মতো বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর কষাকষি ঘটে থাকে। তবে বেকারত্বের উচ্চ হারের কারণে শ্রমিকরা চাকুরীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যৌথ দর কষাকষিতে যায় না । ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌথ দর কষাকষি সাধারণতঃ হয় না। 'দি ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস' তাদের ভাষায় এই ধরনের দর কষাকষির ক্ষেত্রে আইনগত অন্তরায়ের জন্য সরকারের সমালোচনা করেছে।

আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি নেই। তবে ধর্মঘট হচ্ছে শ্রমিকদের প্রতিবাদের একটি সাধারণ পদক্ষেপ এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে ধর্মঘটকে নিষ্পত্তি হয়নি এমন সব বিরোধ নিরসনের একটি বৈধ পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করেছে। পেশাগত সমিতির আওতায় সংগঠিত কিছু চাকুরীজীবি অথবা অনিবন্ধিত ইউনিয়ন এ বছর ধর্মঘট করেছে। তাৎক্ষণিক ধর্মঘট অবৈধ, তবে, প্রায়শঃই এটা ঘটে থাকে। পরিবহণ খাতেই এই ধরনের ধর্মঘট হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

নভেম্বর মাসে নারায়নগঞ্জের প্যানটেক্স গার্মেন্ট ফ্যাকটরিতে ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে পুলিশ একজন শ্রমিককে হত্যা করে এবং কয়েক ডজন শ্রমিককে জখম করে। এই শ্রমিকরা অবশ্য ইউনিয়নের সদস্য ছিলনা এবং তারা বৈধ পন্থায় ধর্মঘটও আহ্বান করেনি। অক্টোবর মাসে পুলিশ ধর্মঘটি ডিপ্লোমা নার্সদেরকে মারধোর করে এবং তাদেরকে হয়রানি করে। (অনুচ্ছেদ ৬ ক দ্রষ্টব্য)

অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী অধ্যাদেশের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় ঘোষিত যে কোন খাতে ৩ মাস ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার এই ক্ষমতা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে । আলোচ্য বছর সরকার সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের ওপর প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখে। ২০০২ সালে মূলত এই অধ্যাদেশ উপরোক্ত সংস্থাগুলোর ওপর প্রয়োগ করা শুরু হয়।

আলোচ্য বছর সরকার উৎপাদন চলাকালীন পাটকলগুলোতে যৌথ দর কষাকষি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতীতে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা জাতীয় বিমান সংস্থার বৈমানিক, পানি সরবরাহ শ্রমিক এবং শিপিং কর্মচারীদের ওপর প্রয়োগ করে। তিন মাস পর পর এই নিষেধাজ্ঞা সরকার পুনরায় জারি করতে পারে। কোন ধর্মঘট বা লক আউট শুরুর আগে বা পরে সেটা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে এবং সেই বিরোধ নিয়ে শ্রম আদালতে মামলা করার ক্ষমতাও সরকারের আছে।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে আপস, মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে ধর্মঘটে যাবার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। যদি ৩০ দিন বা তার অধিক সময় ধরে ধর্মঘট চলে তাহলে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে; যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এমনটি ঘটেনি। ধর্মঘটে যেতে হলে শ্রমিক সংগঠনের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ঐকমত্যের প্রয়োজন বলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে যে বিধান রয়েছে এবং সেই অধ্যাদেশের আওতায় যে কোন সময়ে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার যে ক্ষমতা সরকারের রয়েছে, 'আইএলও' তার সমালোচনা করেছে।

আলোচ্য বছরে দেশের ৫টি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে (ইপিজেড) শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এবং কারখানা আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই সব আইনে আওতায় শ্রমিকদেরকে যে সমিতি গড়ার অধিকার, যৌথভাবে দর কষাকষি করে মজুরি, কাজের সময়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি নির্ধারণের অধিকার দেয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইপিজেড-এলাকার শ্রমিকরা সেগুলো থেকে বাদ পড়েছে। রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বিধানে এই সব অধিকারের কিছু কিছু বিকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও পেশাদারী ও শিল্প ভিত্তিক ইউনিয়ন গঠন রফতানি প্রক্রিয়া এলাকায় নিষিদ্ধ। ইপিজেড এলাকায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ১২৮,৯১৫। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত তার ২০০১ সালের রিপোর্টে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির অভাবে নিন্দা প্রকাশ করেছে এবং শ্রম আইনের সাথে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কতিপয় বিধানের অসঙ্গতির নিন্দা করেছে। এসব অসঙ্গতির মধ্যে রয়েছে সমিতি গড়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষা-কষি সংক্রান্ত। আলোচ্য বছরে আইএলও বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বেসরকারী খাতে স্বেচ্ছামূলক দর-কষাকষি, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনগত রক্ষা ব্যবস্থা না থাকা, ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইনী রক্ষা ব্যবস্থা না থাকা এবং যৌথভাবে দর কষাকষির অধিকার প্রয়োগের বেলায় বিশেষ সমস্যা রয়েছে।

গ. বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সংবিধানে শিশুশ্রমসহ বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ, তবে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। বলপূর্বক শ্রমের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য 'ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট' এবং 'শপস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট'-এ কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তবে তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় না অংশতঃ সম্পদের স্বল্পতার কারণে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম দাসত্ব নেই। অবশ্য অনেক শিশুসহ অসংখ্য গৃহ পরিচারক-গৃহপরিচারিকা দাসত্বের পরিবেশে কাজ করে। তাদের অনেকে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয় এবং এ কারণে কখনো কখনো তাদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। গৃহ পরিচারিকাদের ওপর অব্যাহত সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। সরকার অতীতে ভৃত্যদের ওপর নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে; তবে অনেক গরীব বাবা-মা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করেছেন। শিশু ও নারী পাচার একটি সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করেছে। (অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬.চ দ্রষ্টব্য)

ঘ. শিশু শ্রম পরিস্থিতি এবং চাকুরীর ন্যূনতম বয়স

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সে কাজ করতে শুরু করে। ১৯শে নভেম্বর প্রকাশিত সরকারের জাতীয় শিশু শ্রমিক জরিপের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের আনুমানিক ৩২ লাখ শিশু আলোচ্য বছরে শ্রমে নিয়োজিত ছিল। ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কাজে শিশুদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে ৪৯টিকে শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো শিশুরা কর্মস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয় বা মারা যায়।

শিশুরা প্রায়শঃই ছোট ও প্রান্তিক কৃষি জমিতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করে। সাধারণতঃ তাদেরকে কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং তারা মজুরিও পায় কম। কখনও কখনও তাদের কাজের পরিবেশও থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক শিশুশ্রমিক বিড়ি শিল্পে কাজ করে। এছাড়াও ১৮ বছরের নীচের অনেক শিশু চামড়া কারখানার অথবা ইট ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। শিশুরা নিয়মিতভাবে ঘর-বাড়ির কাজ করে। যে সব গৃহকর্তা ভৃত্যদের ওপর অত্যাচার করেছে অতীতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিটি শিশুর ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা পড়া করা বাধ্যতামূলক। এই আইন কার্যকরভাবে বলবৎ করার কোন প্রক্রিয়া নেই।

রপ্তানিভিত্তিক পোশাক শিল্পের বাইরে শিশু শ্রম বিষয়ক আইন কার্যত বলবৎ করা হয় না। শিশুশ্রম বিষয়ক বিধান লঙ্ঘনের জন্য যে জরিমানার বিধান রয়েছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, ৪ ডলার থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত (২২৮ টাকা থেকে ৫৭০ টাকা পর্যন্ত)। ১৮০,০০০টি রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাত্র ১১০ জন পরিদর্শক নিয়োজিত রয়েছে। ১৫ লাখের বেশি শ্রমিকদের সংগে সংশিষ্ট শ্রম আইন বলবৎ করার দায়িত্ব এই পরিদর্শকদের ওপর ন্যস্ত। অধিকাংশ শিশু শ্রমিক কাজ করে কৃষি ও অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যেখানে কোন সরকারী নজরদারী নেই।

পোশাক খাত থেকে শিশুশ্রম নির্মূল করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সদস্যভুক্ত কারখানা পরিদর্শন করে থাকে। আলোচ্য বছরে যে ৩,৩৪০টি কারখানা তারা পরিদর্শন করে তাতে দেখা যায় ৭১টি সদস্য কারখানায় ১৫৫ জন শিশু শ্রমিক কর্মরত আছে। 'আইসিএফটিইউ'-এর ভাষ্য অনুযায়ী পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ হারে হ্রাস পেয়েছে। ১১৯৫ সালে যেখানে ৪৩ শতাংশ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানা শিশু শ্রম ব্যবহার করেছে, ২০০১ সালে সেই সংখ্যা ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৮ শতাংশে নেমে এসেছে। 'বিজিএমইএ' প্রতিটি কারখানাকে প্রায় ১০০ ডলার (৫,৭০০ টাকা) করে জরিমানা করে। সাবেক শিশু শ্রমিকদের ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোতে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের উপার্জনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে সামান্য বৃত্তিও দেয়া হয়।

সরকারের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কিছু সংখ্যক সহযোগী এনজিও-র সহযোগিতায় সারা দেশের শহরাঞ্চলের বস্তিতে কর্মরত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এরা প্রধানত শ্রমজীবী শিশু। সরকার ১৯৯৪ সাল থেকেই আইএলও-আইপিইসি-এর সদস্য। আইএলও/আইপিইসি-এর কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি নির্দিষ্ট শিল্প কারখানায় নির্মম শিশু শ্রম বিলোপের উদ্দেশ্যে ৬০ লাখ ডলারের একটি প্রকল্প। এই সব হচ্ছে: বিড়ি উৎপাদন, দিয়াশালাই উৎপাদন, চামড়া শিল্প, নির্মাণ শিল্প, এবং গৃহ ভৃত্য। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৯,৮৭৪ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে; ১৯,৫০৮ জন শিশুকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে পাঠানো হয়েছে; এবং ৭,৬২৩ জন শিশু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। একানুটি বিড়ি ও ইট ভাঙ্গার কারখানার মালিক তাদের কর্মস্থলকে "শিশু শ্রমিক মুক্ত" ঘোষণা করেছে।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন ন্যূনতম মজুরি নেই। এর পরিবর্তে কয়েক বছর পর পর গঠিত মজুরি কমিশন শিল্পভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নিয়োগকর্তারা এই বেতন কাঠামো মানেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অনেক পোষাক কারখানা আইন সিদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেরীতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষানবিশী কাল পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও অনেক শ্রমিক শিক্ষানবিশী কালের বেতন পেয়েছেন। ২০০১ সালে 'আইসিএফটিইউ' জানায়, ২১.৭ % শ্রমিক সবচেয়ে কম বেতন পেয়েছেন।

রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত বেশী মজুরি পেয়েছেন। কারখানার এক জন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক ন্যূনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৬৩ ডলার (৩,৪০০ টাকা) ইপিজেড এলাকার বাইরে ৪৯ ডলার (২,৬৫০ টাকা)। এই মজুরি একজন শ্রমিকের পরিবার নিয়ে শোভনীয় জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আইনে এক দিনের বাধ্যতামূলক ছুটিসহ ৪৮ ঘন্টার কর্ম সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বাধিক ১২ ঘন্টার ওভারটাইমসহ ৬০ ঘন্টার সপ্তাহও অনুমোদন করা হয়েছে। এই আইন তেমন কার্যকর করা হয় না।

কারখানা আইনে কর্মস্থলে নামমাত্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদন্ড স্থির করা হয়েছে। এই আইন ব্যাপক, কিন্তু নিয়োগকারীরা তা বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে। আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য শ্রমিকরা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু গুটিকয়েক মামলার বিচার সম্পন্ন হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে তাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ জোরালো নয়। বেকারত্বের উচ্চ হার এবং আইনের অপর্যাপ্ত প্রয়োগের কারণে শ্রমিকরা বিপজ্জনক কাজের পরিবেশ সংশোধনের দাবী করলে বা বিপজ্জনক বলে অনুমিত কাজে অংশগ্রহণের অস্বীকৃতি জানালে তাদের চাকুরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

চ. মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। প্রধানতঃ পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মূলত ভারত, পাকিস্তান ও দেশের অভ্যন্তরেই ব্যাপকভাবে নারী ও শিশু পাচার করা হয়। শ্রম দাসত্বের জন্য মানুষ পাচারের কিছু দৃষ্টান্তও রয়েছে। উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু শিশুকে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হয়। আলোচ্য বছরে মধ্য প্রাচ্যে বালক পাচারের অভিযোগে পুলিশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বছরান্তে এই অভিযুক্তের মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। ২০০২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার সেদেশে শিশু পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রগতি অর্জন করেছে। অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। তবে খুব কম সংখ্যক অপরাধীরই বিচার হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ছাড়াও বেশ কিছু এনজিও পাচারকৃত শিশু উদ্ধার কাজে ও অন্যান্য সহযোগিতা করেছে। আলোচ্য বছর বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন বা 'বিএনডব্লুএলএ' ৬১ জন পাচারকৃত শিশু উদ্ধার করেছে; ৭৬ জন অভিযুক্ত পাচারকারীকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আটক রাখা হয়েছে; এবং ১৬ জন পাচারকারীকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

এই অপরাধে ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে খবর জানা কষ্টকর, কেননা, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধের জন্য -- যেমন যথাযথ ছাড়পত্র ছাড়াই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা, ইত্যাদি। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন স্টাডিজ (সিডব্লিউসিএস)-এর পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলা হয়, পাচারকৃত শিশুদের এক শতাংশ এবং অপহৃত শিশুদের ৫৫ শতাংশকে ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০২ সালের জুন মাসের মধ্যে উদ্ধার করা হয়। সিডব্লিউসিএস-এর তথ্য অনুযায়ী পাচারকৃত ছেলেদের অধিকাংশেরই বয়স দশ বছরের নিচে এবং পাচারকৃত মেয়েদের অধিকাংশেরই বয়স ১১ থেকে ১৬-র মধ্যে।

সরকার পাচার সমস্যার ব্যাপারে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে একটি কার্যক্রমের সূচনা করেছে। আদম পাচারের দায়ে গ্রেফতার ও বিচার কাজ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে, জাতীয় পাচার প্রতিরোধ অভিযান শুরু করা হয়েছে যাতে এ সমস্যা সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। তবুও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে। পাচার বিরোধী সরকারী প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার, গবেষণা, লবিং, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। পাচারকৃতদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে, তাদের সরকার

সহায়তা দিলেও সরকার পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অপর্যাপ্ত এবং সেগুলো দুর্বলভাবে পরিচালিত। পাচার সমস্যা মোকাবিলায় একটি যৌথ প্রকল্প হচ্ছে নরওয়েজীয় সাহায্য সংস্থা নোরাডের সংগে যা পাচার সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কৌশল নীতি প্রণয়ন করবে। গ্রাম পর্যায়ে জন্ম এবং বিবাহের রেকর্ড না থাকার সমস্যা সত্ত্বেও কিছু পাচার মামলার বিচার হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

ঠিক কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হিসাব করেছেন যে, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে দেশ থেকে পাচার করা হয়। ভাল চাকুরি বা বিয়ের লোভ দেখিয়ে অধিকাংশকে পাচার করা হয়। কাউকে কাউকে দেশের বাইরে দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য । দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ না পেয়ে কোন কোন পিতামাতা কখনো কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেমেয়েদের অন্যত্র পাঠায়। অবিবাহিত মা, এতিম বা স্বাভাবিক পারিবারিক ছত্রছায়ার বাইরে যারা, তাদের পাচার হয়ে যাওয়ার বেশি ঝুঁকি থাকে। বিদেশে বসবাসকারী পাচারকারীরা কোন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় কোন মেয়েকে বিয়ে করে গন্তব্যে গিয়ে বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুন "বন্ধু" বা "স্বামীর" কাছে বিক্রি করে দেয়া মেয়েটিকে জোর করে লাগানো হয় শ্রম দাসত্বে, দৈহিক কাজে বা পতিতাবৃত্তিতে। অপরাধীদের চক্রগুলোও কিছু মানুষ পাচারের কাজে নিয়োজিত থাকে। ভারতের সংগে সীমান্তে, বিশেষ করে যশোর ও বেনাপোল সীমান্তে, নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় সহজেই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা যায়।

শিশু পতিতার সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা কঠিন। পতিতাবৃত্তি আইনসিদ্ধ; কিন্তু, কেবল ১৮ বছরের বেশি বয়সের কেউ সরকারী সার্টিফিকেট নিয়ে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে পারে। বয়স সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ দিয়ে এই বিধানকে সহজেই এড়ানো হয়েছে। পতিতাবৃত্তিতে নামানোর জন্য যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সংগ্রহ করে তাদের কদাচিৎ বিচার হয় এবং বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে পতিতালয়ে কাজ করে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী পাচারের দায়ে ১০ বছরের কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেয়ার বিধান রয়েছে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাসযোগ্য খবর অনুযায়ী পুলিশ ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তারা প্রায়ই নারী ও শিশু পাচার উপেক্ষা করে থাকে। চোখ বুঁজে থাকার জন্য তাদের সহজেই ঘুষ দেয়া যায় (অনুচ্ছেদ ১.গ ও ৫ দ্রষ্টব্য)।

এই মর্মে বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট রয়েছে যে আলোচ্য বছরে পুলিশ শিশু ও নারী পাচারে সহায়তা করেছে। যখন পাচারকারীরা সীমান্তে মানুষ পাচার করার সময় ধরা পড়ে, তখন পুলিশ প্রায়ই নির্লিপ্ত থাকে। পুলিশ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মানুষ পাচারের পরিবর্তে "পাসপোর্ট জালিয়াতি" অথবা জাল কাগজপত্র পেশ করার অভিযোগ দায়ের করে। পাচারকারীদের মধ্যে সংগঠিত অপরাধী চক্রসহ চাকুরীদাতা এজেন্সীগুলোও জড়িত রয়েছে। একটি শিশুকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পাচার করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাচারকারীকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়ার বিধান আইনে রয়েছে।

অনেক এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন, প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্কিং, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আইন প্রয়োগ, উদ্ধার, পাচারকৃতদের পুনর্বাসন, এবং আইন সংস্কারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পাচার বিরোধী একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক 'অ্যাকশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং অ্যান্ড সেক্স্যুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অব চিলড্রেন' (এটিএসইসি) সম্প্রতি বেশ কয়েকটি পাচার বিরোধী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনজিও এবং সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করা, জাতীয় পাচার বিরোধী এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা, এ বিষয়ে উপাত্ত লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পাচার সমস্যার ওপরে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে এবং কর্মশিবির ও সচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। পাচারের শিকার হওয়ার আগেই এই কর্মসূচী যাতে

সম্ভাব্য শিকারদের কাছে পৌঁছে সে কার্যক্রম তাদের রয়েছে। বিগত তিন বছরে এনজিও এবং সরকার সহ অন্যান্য সকলের মধ্যে সহযোগিতার ফলে পাচার সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

==========

জিআর/ ২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*